বিজ্ঞান মনস্ক'র মুখপত্র

সমীক্ষণ

চতুর্থ বর্ষ ■ সংখ্যা ১ ■ মার্চ ২০১৪

■ সম্পাদকীয় ঃ শক্তি ও মানবসভ্যতা
■ নিবন্ধ ঃ মানব সমাজে সমকামিতা কি যৌন বৈচিত্র্য!
■ বিজ্ঞানের খবর
■ বিজ্ঞানের সেরা ১০ আবিষ্কার – ২০১৩

চতুর্থ বর্ষ❖সংখ্যা - ১❖মার্চ ২০১৪

–ঃ সূচীপত্র ঃ–

সম্পাদকীয় ঃ	শক্তি ও মানবসভ্যতা	৩
সমাজ দর্পণ ঃ	লাভপুরের মধ্যযুগীয় বর্বরতা ব্যাতিক্রম নয়	৫
	রাণীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলের সামডি-তে আবার ধস	৬
চিঠিপত্র ঃ		৭
নিবন্ধ ঃ	পারমাণবিক শক্তি কি মানব কল্যাণের অন্তরায় ?	৮
জিজ্ঞাসা এবং তার সমাধান ঃ	ঘুমের মধ্যে আমরা স্বপ্ন দেখি কেন ?	১৮
	সাপের মত বিষাক্ত প্রাণীরা নিজেদের বিষে আক্রান্ত হয় না কেন ?	২১
পাঠকের মতামত ঃ	মনুষ্যজনিত কারণেই বিশ্ব উষ্ণায়ণ	২২
মতামত ঃ	সমকামিতা কি বিজ্ঞান সম্মত?	২৩
নিবন্ধ ঃ	মানব সমাজে সমকামিতা কি যৌন বৈচিত্র্য!	২৮
বিজ্ঞানের খবর ঃ		৩৫
বিজ্ঞানের সেরা ১০ আবিষ্কার – ২০১৩ ঃ		৩৭
সংগঠন সংবাদ ঃ		৩৮

বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষে নন্দা মুখার্জী প্রযত্নে অপন মোতিলাল, দিপ্তীকণা অ্যাপার্টমেন্ট, ১১৪ মাঝিপাড়া রোড, ফ্ল্যাট নম্বর এ ২,
কলিকাতা - ৭০০০৬৩, কর্তৃক প্রকাশিত ও আদ্যাশ্রী প্রেস ২/এ যোগী পাড়া রোড, কোলকাতা ৭০০ ০০৬ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ শিশির কর্মকার ঃ ৯৪৩২ ৩০০৮২৫ প্রকাশক ঃ নন্দা মুখার্জী ঃ ৯৮৮৩ ২৯৯৯২৮
Email : samikshan2009@gmail.com

সম্পাদকীয়

শক্তি ও মানবসভ্যতা

মানবসভ্যতার সূচনা এবং তার অগ্রগতি শক্তির ব্যবহার ব্যতীত সম্ভব ছিল না। প্রকৃতির সমস্ত শক্তির একমাত্র উৎস হল সূর্য। মানুষসহ সমস্ত জীব-জন্তু ও উদ্ভিদ প্রকৃতি হতে খাদ্যের মাধ্যমে সরাসরি শক্তি সংগ্রহ করে ও জীবন ধারণ করে। তবে একমাত্র মানুষই কৃত্রিমভাবে প্রাকৃতিক শক্তিকে অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম। এই ক্ষমতাই মানুষকে পৃথিবীর অধীশ্বর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আগুনের আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত মানুষ প্রকৃতিতে খাদ্য সংগ্রহ করেছে কোন প্রক্রিয়াকরণ ছাড়াই। সমস্ত বলশালী জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়েই মানুষ সংগ্রহ করেছে তার খাদ্য। তার বেঁচে থাকার রসদ। মানুষ হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে একে অপরের খাদ্য হিসাবে দীর্ঘ জঙ্গল-জীবন যাপনে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তার আত্মরক্ষার প্রযুক্তি আবিষ্কার করে। আবিষ্কার করে শিকারের কৌশল পদ্ধতি। অস্ত্রের আবিষ্কার ব্যতীত যা ছিল অসম্ভব। এইভাবে দীর্ঘ জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সফল প্রয়োগের মাধ্যমে সর্বক্ষেত্রেই মানুষ অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারকে বহু-যোজন পিছনে ফেলে সভ্যতার অগ্রগতি ঘটাতে থাকে। আগুনের আবিষ্কার ও তার ব্যবহার সভ্যতার এই অগ্রগতিতে উল্লম্ফন ঘটায়। বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা যেমন দাবানল, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদির মধ্যে আগুনের বিধ্বংসী ও ভয়াল রূপ দেখেছিল আদিম মানুষ। যে আগুনের কাছে অতীতে সে নিজেকে নিরুপায় হয়ে আত্মসমর্পন করেছিল। সেই আগুনকে সে পোষ মানাতে শিখল। শিখল আগুনের সংরক্ষণ। আর এইভাবেই দিন ও রাতের পার্থক্য ক্রমশঃ সংকুচিত হল। এইভাবে মানুষ অন্ধকারকে জয় করল। আগুন অর্থাৎ তাপশক্তি মানব সমাজকে নবরূপে সজ্জিত করল। তার ব্যবহারের সমস্ত সামগ্রীকে আগুনের সংস্পর্শে এনে তার পরিবর্তন লক্ষ্য করল। এই কৌতূহল নিবৃত্ত করার মধ্য দিয়ে নিজের অজান্তেই সে গবেষণার হাতেখড়ি দিয়ে বসল। এতদিন সে যে কাঁচা মাংস গ্রহণ করে এসেছে খাদ্য হিসাবে, সেটাকেও আগুনে ঝলসে নিয়ে দেখেছে তা আরও সুস্বাদু ও সুপাচ্য। শুরু হল খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ। এইভাবে সে তার খাদ্যাভ্যাসটাকে বদলে ফেলল যা পক্ষান্তরে তার মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটালো। আগুনের আবিষ্কারের পর ধাতুবিদ্যারও সূচনা হল। ভূত্বকের উপরিতলে নদীর অববাহিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন ধাতুর (মূলতঃ তামার) আকরিককে আগুনে গলিয়ে একদিন আকস্মিকভাবেই তা থেকে ধাতু বার করে আনল মানুষ। এতদিন জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে পাথর ব্যবহার করা হত। ধাতুর আবিষ্কারের পর পাথরের ব্যবহার ধীরে ধীরে পিছু হঠতে লাগল আর ধাতু তার স্থান দখল করল। প্রস্তর যুগকে পিছনে ফেলে মানুষ ধাতুযুগে প্রবেশ করল। প্রথমে তাম্রযুগ ও পরে ব্রোঞ্জ (সংকর ধাতু) যুগের আবির্ভাব মানুষের ধাতুবিদ্যার বিকাশের সাক্ষ্য বহন করে। ধাতু যুগে মানুষের সমাজ জীবন অনেক সুসংহত হল। কৃষি কাজ, পশুপালন, ইমারতি কার্য ইত্যাদি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক উৎপাদন বৃদ্ধি পেল, বিভিন্ন ব্যবহারিক সামগ্রীর সামাজিক চাহিদা বৃদ্ধি পেল, আর এ সব কিছুই সম্ভব হয়েছিল তাপশক্তি তথা আগুনের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে।

কিন্তু এই বিকাশ সমাজের সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে হয় নি। কোথাও এর বিকাশ হয়েছে অনেক বেশী, কোথাও কম। সমাজ শ্রেণী বিভক্ত হয়ে পড়ায় একদল মানুষের হাতে রয়ে গেল সামাজিক উৎপাদনের চাবিকাঠি – তারা পরিণত হল শাসক বা শোষকশ্রেণী হিসাবে। অন্যদিকে সমাজের অবশিষ্ট আপামর মানুষ রয়ে গেল তাদের পদানত হয়ে - শাসিত বা শোষিত শ্রেণী হিসাবে। সমাজ প্রগতির হাত ধরে বিভিন্ন সময়ে, উৎপাদন ব্যবস্থা বিকাশের সাথে সাথে বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটেছে। আদিম মানবসভ্যতা ব্যতীত আজ পর্যন্ত কায়েম হওয়া সকল সমাজব্যবস্থাই হল শ্রেণীভিত্তিক।

আদিম সামাজিক উৎপাদনের বিকাশ তাপশক্তির

ব্যবহারের মাধ্যমে আরম্ভ হলেও পরবর্তীকালে সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে এবং আরও পরে বিজ্ঞানের বিকাশের সাথে সাথে মানুষ অন্যান্য শক্তিকেও ব্যবহার করেছে। এমনকি এক শক্তিকে অন্যশক্তিতে রূপান্তরিত করেছে ও সামাজিক উৎপাদনে তা প্রয়োগ করেছে। প্রাকৃতিক যান্ত্রিক শক্তি যেমন বায়ুপ্রবাহ, নদীর জলপ্রবাহ, সমুদ্রের জোয়ার ভাটার শক্তিকে সরাসরি কাজে লাগিয়েছে। লিভারের ব্যবহার করেছে ও তা হতে যান্ত্রিক সুবিধা আদায় করার নিয়ম আবিষ্কার করেছে। বায়ুর গতিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ 'উইন্ড মিল' বানিয়েছে ও পেষাই কাজে তা ব্যবহার করেছে। জলপ্রবাহে নিহিত গতিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে টারবাইন ঘুরিয়েছে, পরবর্তীতে তা জেনারেটরের সঙ্গে যুক্ত করে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে বিদ্যুৎশক্তির আবিষ্কার, তার উৎপাদন ও অন্য শক্তিতে রূপান্তরের বিজ্ঞান সামাজিক উৎপাদন তথা সমাজজীবনে যে কেবল অকল্পনীয় পরিবর্তনই এনেছে এমন নয়। মানুষের জ্ঞানের পরিসীমা গ্রহ-গ্রহান্তর ছাড়িয়ে অসীমে ধাবিত হয়েছে এবং ক্রমশঃ হয়েই চলেছে।

তাপশক্তি হতে যান্ত্রিকশক্তির রূপান্তরের বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে নির্মিত বাষ্পইঞ্জিন সমাজের উৎপাদনকে ধারণাতীত বিকশিত করে। তাপশক্তি হতে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন অর্থাৎ তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন জ্বালানী যেমন কয়লা, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি জীবাশ্ম জ্বালানী দহনের ফলে উদ্ভুত তাপশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করে প্রচুর পরিমান তাপবিদ্যুৎ তৈরী করা হয়ে থাকে। এছাড়াও পারমাণবিক শক্তিকেও বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। বর্তমান দুনিয়ায় মোট উৎপাদিত বিদ্যুৎশক্তির সিংহভাগ দখল করে আছে তাপবিদ্যুৎ ও পারমাণবিক বিদ্যুৎ। শ্রেণীভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় বিভিন্নপ্রকার শক্তি সহ সামাজিক উৎপাদনের সমস্ত উপায় উপকরণের মালিক হল শাসক গোষ্ঠী। বর্তমান দুনিয়াতে সমস্ত সামাজিক উৎপাদন মানাফার লক্ষ্যেই চালিত হয় তাই সমস্ত উৎপাদিত পণ্যের মত বিদ্যুৎশক্তিও একটি পণ্য এবং তা ক্রয়-বিক্রয় যোগ্য। এই অর্থনীতির নিয়ম অনুযায়ী কোন সামগ্রীই মানুষের প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে উৎপাদিত হয় না বরং চাহিদা-যোগানের নিয়ম মেনেই মুনাফার লক্ষ্যে উৎপাদিত হয়। ফলে দরিদ্র আরও দরিদ্র হচ্ছে আর সমাজের পরিচালক গোষ্ঠীর হাতে সঞ্চিত হচ্ছে প্রচুর সম্পদ। ফলস্বরূপ উৎপাদন ব্যবস্থার সংকট তীব্র হতে তীব্রতর হচ্ছে ও যুযুধান দুই গোষ্ঠী শাসক গোষ্ঠী ও শাসিতগোষ্ঠীকে মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই বিপুল বিকাশ, শক্তির প্রয়োগ উৎপাদন ব্যবস্থার যে বিকাশ ঘটিয়েছে বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজ তা ধারণ করতে পারছে না। বাজারের লক্ষ্যে পরিচালিত এই উৎপাদন ব্যবস্থা তাই ভুগছে 'অতি উৎপাদনের সংকটে', এই কারণে শাসকশ্রেণীর বিভিন্ন গোষ্ঠী, উৎপাদনের বিকাশ পরিবেশের পরিপন্থী এই মত তুলে ধরে জনমানসে প্রচার করছে। শাসকশ্রেণীর সৃষ্ট ও মদতপুষ্ট এন জি ও-রা পরিবেশের সংরক্ষণের নামে কোথাও জলবিদ্যুৎ, কোথাও তাপবিদ্যুৎ আবার কোথাও পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিলের দাবীতে সোচ্চার হচ্ছে। জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি নদীর স্বাভাবিক গতিপথ নষ্ট করে প্রকৃতিকে ধ্বংস করছে, তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, পৃথিবী উষ্ণ হচ্ছে বলা হচ্ছে। পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্পের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে-এই শক্তি উৎপাদনের ফলে কর্মরত মানুষ, বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের লাগাতার ক্ষতি হচ্ছে, পরমাণু বর্জ্য বোমা তৈরীর মসলা তৈরী করছে এবং তার নিষ্ক্রমণ সমগ্র বিশ্বে স্থায়ী বিপদ ডেকে এনেছে।

এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে যান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ তথা স্টীম ইঞ্জিনের আবিষ্কারের পর আধুনিক পুঁজিবাদের সূচনাকাল থেকে মানুষ প্রকৃতিকে ধীরে ধীরে নিজের করায়ত্ব করে চলেছে। প্রাকৃতিক নিয়মে পরিবেশের পরিবর্তনের পাশাপাশি মানব সভ্যতাও কিছুমাত্রায় পরিবেশের উপর প্রভাব ফেলেছে। বিজ্ঞানী তথা বিজ্ঞান মনস্ক জনতা এই দিকটিকে উপেক্ষা করে না। বৈজ্ঞানিকভাবে ক্ষতিকর প্রভাব দূর করার প্রয়াসও চলেছে। কিন্তু সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থার মালিকানা যে শ্রেণীর হাতে তার লক্ষ্য মানবকল্যাণ নয়, মুনাফা আরও মুনাফা, এর ফলে প্রকৃতিকে মানবকল্যাণে ব্যবহারের প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এর ক্ষতিকর প্রভাব দূরীকরণের ব্যবস্থা তারা নেয় না। বিশ্ব জুড়ে সমাজ সচেতন মানুষ এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হন, আরও সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তাপশক্তি বা পারমাণবিক শক্তি সহ নানাবিধ উৎপাদনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে বলে তা বন্ধ করার দাবী কি প্রগতিশীল? যা আগামী বিকশিত সমাজের পক্ষে,তার পক্ষ নেওয়াই প্রগতিশীলতা নয় কি? কারণের অবসানে সংকল্পবদ্ধ না হয়ে ফলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কি বিজ্ঞান মনস্কতার পরিচয় ? ■

সমাজ দর্পণ

লাভপুরের মধ্যযুগীয় বর্বরতা ব্যাতিক্রম নয়

বীরভূম জেলার লাভপুর থানার সুবলপুর। এই থানার রাজারামপুর গ্রামের ২০ বছরের আদিবাসী তরুণী চৌহাট্টার গাজীপাড়া নিবাসী মুসলমান যুবক শেখ খালেকের সাথে প্রায় ৫ বছর প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ ছিল। কিছুদিন আগে ওই মেয়েটি খালেকের সাথে দিল্লিতে মজুরির কাজে গিয়েছিল। গ্রামে ফেরার পর গত ২০শে জানুয়ারী খালেক মেয়েটিকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে তাদের বাড়ি যায়। বিভিন্ন সংবাদসূত্রের খবর অনুযায়ী খালেক আগে থেকেই বিবাহিত হওয়ায় এবং ভিন্ন সমাজ ও ধর্মের হওয়ায় মেয়েটির বাড়ির লোকের এই বিয়েতে মত ছিল না। কিন্তু সব জেনেও মেয়েটি রাজী থাকায় শেষমেশ মেয়ের বাড়ি বিয়েতে মত দেয়। এই খবর জানাজানি হওয়ায় গাঁয়ের মোড়লরা (মেয়েটির ঘনিষ্ঠ আত্মীয়) দুজনকে ধরে গাছের সাথে বেঁধে ফেলে এবং খাপ পঞ্চায়েত বসায়। সন্ধ্যায় সালিসী সভায় চৌহাট্টা-মহোদরী ১নং পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য অজয় মন্ডলও উপস্থিত ছিলেন। সালিশী সভায় মীমাংসাপত্র তৈরী হয়। সেখানে বলা হয় "সমস্ত ফয়সালা মানিয়া উভয়পক্ষ সাক্ষর করিল এবং দ্বিতীয় পক্ষ (শেখ খালেকের পরিবার) কে মুক্তি দিলো। ইহাতে কারও আপত্তি থাকিল না।" ফয়সালা কি হয়েছিল? প্রত্যক্ষ অনুসন্ধান করতে না পারায় বিভিন্ন সংবাদপত্রকেই ভরসা করতে হবে। বলা হয় ভিন্ন সমাজ ও ধর্মের পুরুষকে ভালোবাসার জন্য মেয়েটির পরিবারকে জরিমানা দিতে হবে। পুলিশের ডায়েরিতে মেয়েটি লিখেছে জরিমানা ধার্য হয়েছিল ২৭ হাজার টাকা, কোন পত্রিকায় ৫০ হাজার টাকা আবার কোনটায় ২৫ হাজার টাকা। সে যাই হোক মেয়েটির পরিবার জরিমানা দিতে পারবে না জানানোয় গাঁয়ের মোড়ল উপস্থিত পুরুষদের উদ্দেশ্যে বলে "তোরা ফূর্তি করে লে।"

সমাজপতির নির্দেশে ছেলে বুড়োদের সারারাত ধরে চলে ফূর্তি। মোড়ল বলাই মাড্ডির রান্নাঘরে প্রায় ১৪ জন পুরুষ সেই নির্দেশ মান্য করে। তারপর মধ্যরাতে অচেতন মেয়েটিকে ফেলে যাওয়া হয় তার বাড়ির সামনে।

গ্রামটি জেলাসদর সিউড়ি থেকে গাড়িতে বড়জোর আধঘন্টা দূরত্বের, আহমেদপুর রেল স্টেশন থেকে মাত্র ৪ কি.মি এবং দেশের প্রেসিডেন্টের বাড়ি থেকে মাত্র ২২ কি.মি দূরত্বে অবস্থিত, কোন দুর্গম জঙ্গলে নয়। তবু অনেকে এটাকে হয়ত জঙ্গলই বলবেন কারণ একবিংশ শতাব্দীর উন্নত ভারতে এমন ঘটনায় অনেকেই আশ্চর্য!

ঘটনা মিডিয়ার দৌলতে প্রচারের আলোয় এসেছে। প্রতিদিনকার শত শত ধর্ষণের ঘটনার মত হারিয়ে যায় নি। কারণ এই মেয়েটি তো কামদুনি, মধ্যমগ্রাম..... এর মেয়েগুলির মত এক বা একাধিক পুরুষের শুধু লালসার শিকার নয়। এ তো পঞ্চায়েত সদস্যের উপস্থিতিতে গ্রাম্য সালিশী সভার 'সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত'! এ তো অন্যায়ের অবসানে শাস্তি বিধান!

তাই সুপ্রীম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে উন্নত ভারতের উজ্জ্বল মুখরক্ষায় তদন্তের নির্দেশ দিয়ে ক্ষতে দ্রুত মলম লাগানোর ব্যবস্থা করেছে।

ঘটনায় নাগরিক সমাজ নাকি বিস্মিত! কেউ সুপ্রীম কোর্টকে সাধুবাদ দিচ্ছেন, কেউ অন্য রাজ্যের মত সংস্কৃতিবান এই রাজ্যে এমন ঘটনা ঘটায় লজ্জিত! কেউ আবার ভিন্ ধর্মের বিবাহিত পুরুষের সাথে সম্পর্ক করায় মেয়েটিকেই দোষ দিচ্ছেন। আবার মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য প্রশাসনকে সমালোচনা করে মধ্যযুগীয় বর্বরতা বন্ধ করতে আইন লাগু করতে বলছেন। সরজমিনে তদন্ত করলে অনেক তথ্য হয়ত উঠে আসত। সেটা করতে না পারার জন্য আমরা আত্মসমালোচনা করছি। কিন্তু এটা কি কোন নতুন ঘটনা?

২০১০ সালে বীরভূমের রামপুরহাট ব্লকেই ভিন্ সমাজের ছেলেকে ভালোবাসার জন্য একটি আদিবাসী মেয়েকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে গ্রামে ঘোরানো হয়েছিল ঐ খাপ পঞ্চায়েতের নির্দেশেই। ২০০২ সালে বিহারের মুজফ্ফরগড়ে মাসতোই উপাজাতির নিজস্ব গ্রামসভা একটি মেয়ের উপর এইভাবেই গণধর্ষণের নির্দেশ দিয়েছিল। আদিবাসী সমাজেভিন্ সমাজের পুরুষকে ভালোবাসার জন্য এইরকম নির্দেশ এদেশে হাজার হাজার বার দেওয়া হয়েছে। এর অতি ক্ষুদ্র অংশই সংবাদে

এসেছে। শুধু এ রাজ্যেই নয় বিহার, উঃ প্রদেশ, হরিয়ানা, পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, কেরল, তামিলনাড়ু, উড়িষ্যাসহ দেশের প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই প্রতিনিয়ত এমন ঘটনা ঘটছে। দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা, প্রশাসন, রাজনৈতিক দলগুলি এবং বিভিন্ন এনজিও গুলি আদিবাসীদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে রক্ষা করার নামে সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই প্রাচীন সামাজিক রীতিগুলি সমাজে লালন-পালন করার কাজে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছে। সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার প্রয়াস জারী রেখেছে। সুতরাং এই ঘটনার জন্য এই রাষ্ট্রব্যবস্থা ও তার অংশীদারদের বিরুদ্ধেই আঙুল তুলতে হবে। এদেরকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে।

শুধু আদিবাসী সমাজ কেন? দেশের সর্বত্র ভিন্ ধর্মের, ভিন্ জাতের নারী পুরুষকে ভালোবাসার জন্য কত হাজার ছেলেমেয়েকে এমন শাস্তি পেতে হয়েছে তার সংখ্যা গোনা সম্ভব নয়। শিল্পপতি টোডির মেয়েকে ভালোবাসার জন্য মধ্যবিত্ত মুসলমান যুবক রিজওয়ানুর রহমনকে মরতে হয়নি? সমাজচ্যুত হতে হয়নি মুর্শিদাবাদের স্কুলের দুই শিক্ষক শিক্ষিকাকে? পুঁজিপতিশ্রেণী ছাড়া অন্য কোন শ্রেণীর ভিন্ ধর্মের ছেলে মেয়েকে বিবাহের অনুমতি, মেলামেশার অনুমতি আমাদের দেশে কোথাও কোনদিন স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। আমির, শাহরুক, শর্মিলা ঠাকুর, ঋত্বিকদের জন্য এক নিয়ম আর রিজওয়ানুর, মুখতারন, স্বপ্নাদের জন্য অন্য নিয়ম। অর্থনৈতিকভাবে স্ব-নির্ভর মধ্যবিত্ত ভিন্ ধর্মের ছেলেমেয়েরা লুকিয়ে বিয়ে করলেও তাঁদের জাত-ধর্মের পরিচয় লুকিয়েই বাঁচতে হয়।

ধর্ম-বর্ণে বিভক্ত এই সমাজকে টিঁকিয়ে রেখেছে যে শ্রেণী সেই পুঁজিপতিশ্রেণীর বেলায় এক নিয়ম আর শ্রমজীবী শ্রেণীর জন্য আলাদা। প্রতিটি ধর্মই নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করে আর অন্য ধর্মকে ঘৃণা করতে শেখায়। পিছিয়ে পড়া আদিবাসী সমাজে যা হয় প্রকাশ্যে ও নগ্নভাবে, তথাকথিত সভ্য ও উন্নত সমাজে তা হয় পর্দার আড়ালে। তাই আফগানিস্তান - পাকিস্তানের মত বা তার চেয়েও ভয়ঙ্কর 'তালিবানি' রাজ সুপার পাওয়ার হতে চলা ভারতেও জারি আছে এটা প্রকাশ্য হয়ে পড়ায় এই উন্নতির স্তাবকরা একটু লজ্জিত। লাভপুরের মেয়েটি তার যন্ত্রণা দিয়ে জানিয়ে গেল পুঁজিবাদী সমাজও এই মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে প্রশয় দেয়। জাত-ধর্ম-ভাষা-আঞ্চলিকতার দ্বন্দ্বকে প্রশয় দেয়। কারণ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শ্রমজীবী জনতার একতাকেই সে ভয় পায়। তাই মধ্যযুগীয় বর্বরতার অবসান করতে হলে, ধর্ম-বর্ণ-ভাষার বেড়াজাল ভেঙে মানুষে মানুষে একতা, সম্পর্ক, আত্মীয়তা গড়তে হলে শ্রমজীবী মানুষকে আগে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার অবসানের কথাই ভাবতে হবে।■

রাণীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলের সামডি-তে আবার ধস

হাইকোর্টে আবার বেআইনি খনি বন্ধের জন্য আবেদন

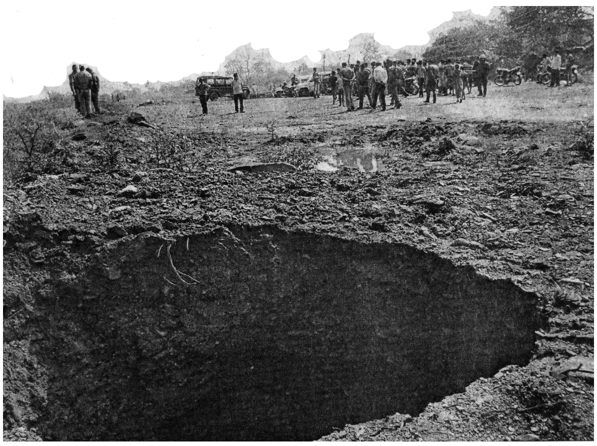

২রা মার্চ ২০১৪, রবিবার রাতে অনেকটা এলাকাজুড়ে আবার বড় ধস নামল সামডির মুচিপাড়ায়। সম্প্রতি এই মুচিপাড়া এলাকা থেকে আসানসোল-দুর্গাপুর ডেভলপমেন্ট অথরিটির নির্দেশে ই সি এল কর্তৃপক্ষ ২০১ টি পরিবারকে প্রকৃত পুর্নবাসন ছাড়াই উচ্ছেদ করেছে। ৪০টি পরিবার কোথায় গেছে জানা যায় নি, বাকী পরিবারগুলিকে ই সি এল-এর বিপজ্জনক ও পরিত্যক্ত আবাসনে রাখা হয়েছে। রবিবার রাতে এই মুচিপাড়ায় মাটি ভেদ করে আগুন ওঠে, ধস নামতে থাকে। ধস নামতে তাকায় বিডিও, পুলিশকে খবর দেয় অঞ্চলের মানুষ। সোমবার ৩রা মার্চ ই সি এল কর্তৃপক্ষ ক্ষতে প্রলেপ দিতে অতীতের মত মাটি ভরাট করে। পুরো সামডি

গ্রামের ২৫০টি পরিবারের মানুষ বিপন্ন অবস্থায়। তাঁরা একবছর ধরে জমির আল ধরে যাতাযাত করছেন। গ্রামে অ্যাম্বুলেন্স ঢোকে না। খাটে রুগীকে শুয়িয়ে কাঁধে করে তাকে গ্রামের বড় রাস্তায় আনতে হয়।

গত সংখ্যায় (বর্ষ ৩, সংখ্যা ৪) আমরা বিস্তারিতভাবে রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়া কয়লাশিল্প অঞ্চলে আসন্ন বিপদ, এর কারণ, সরকারী পুর্নবাসের প্রকল্পের হালহকিকত এবং সমাধানের পথ নিয়ে বিস্তারিত চর্চা করেছি। আমাদের সাধ্য অনুসারে মানুষের কাছে তা প্রচারে নিয়ে গিয়ে সচেতন করার প্রয়াস নিয়েছি। গত ২রা মার্চ সামডি-তে যা ঘটেছে (সাকতোড়িয়ার মত কেউ মারা যায়নি) তা একেবারেই অপ্রত্যাশিত নয়- বিজ্ঞানী তথা এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে। দীর্ঘকাল ধরে রোজই এমন হচ্ছে। বড় ঘটনা ঘটলে তা সংবাদে আসে। মানুষের লাগাতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই পারে প্রশাসনকে বাধ্য করে সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধান করতে। হাতগুটিয়ে বসে থাকলে সামনে সমূহ বিপদ।

সম্প্রতি পান্ডবেশ্বরের বিধায়ক গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জি আসানসোল-রাণীগঞ্জ এলাকার বে-আইনী কয়লাখনিগুলি বন্ধ করতে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থে মামলা করেছেন। মামলায় বলা হয়েছিল প্রায় প্রতিদিন খনিতে দুর্ঘটনা ঘটছে। শ্রমিকরা বে-আইনি কয়লা খনিতে কাজ করতে প্রাণ হারাচ্ছেন। বিশেষ করে বেআইনিভাবে কয়লা তোলার জন্য সমগ্র অঞ্চল ধসপ্রবণ হয়ে পড়ছে। এখনই এই কয়লাখনিগুলি বন্ধ না করলে আসানসোল-রাণীগঞ্জ অঞ্চলে বড় ধরণের দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। ই সি এল-এর ডি জি এই অঞ্চলের ৭১টি খোলামুখ খনি বিপজ্জনক ঘোষণা করলেও সেগুলি ভরাটের কোন উদ্যোগ নেয়নি। এগুলি থেকে এখনও বেআইনিভাবে কয়লা পাচার হচ্ছে।

হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ই সি এল কর্তৃপক্ষ, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে তিন সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

অর্থাৎ আবার চর্বিত চর্বন! অঞ্চলের মানুষেরা দীর্ঘদিন এসব নাটুকেপনা দেখে বীতশ্রদ্ধ। কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে সমস্যা সমাধানে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সূচনা কবে হবে ? ■

চিঠিপত্র

প্রিয় সম্পাদক ও সদস্যবৃন্দ
"বিজ্ঞান মনস্ক"
সাথী,

আপনাদের বিগত বার্ষিক অনুষ্ঠান, যা গত ১৬/০২/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং যাতে আমি সানন্দে হাজির ছিলাম, সে নিয়ে কয়েকটি কথা বলবার জন্য এই পত্র। ১৬ ফেব্রুয়ারি দিনটি ছিল অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ। তার মধ্যেও আপনারা যেভাবে দৃঢ়তা ও উৎসাহের সাথে অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন করেছেন তার জন্য ব্যক্তিগতভাবে এবং যুক্তিবাদী সমিতির তরফেও আপনাদের অভিনন্দন জানাই। গত কয়েকবছর ধরে বিজ্ঞানমনস্কতার প্রচার ও প্রসারের স্বার্থে নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশসহ আরও যা কিছু আপনারা করে চলেছেন তা অবশ্যই বিশেষ সাধুবাদের যোগ্য।

ওই দিনের অনুষ্ঠানের নানা পর্ব আমি মন দিয়ে দেখেছি এবং উপভোগ করেছি। পত্রিকা নিয়ে অল্পবয়সী পাঠকদের মতামত ছিল প্রাণবন্ত। পরবর্তী পর্যায়ে 'সমকামিতা' নিয়ে বিতর্কেও নানা মূল্যবান কথা উঠে এসেছে। শেষে এবিষয়ে আপনাদের নিজস্ব মতামত যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তার দৃঢ়তাটুকু আকর্ষণীয়, তবে তা প্রশ্নাকারে রাখা হলে বিজ্ঞানমনস্ক গণতান্ত্রিক মেজাজের সঙ্গে আরও একটু সঙ্গতিপূর্ণ হত বলে মনে হয়। অনুষ্ঠানের শেষপর্বে পরমাণু বিদ্যুৎ নিয়ে স্লাইড শো-টি ছিল সুন্দর, তার আশাবাদ আমাদের স্পর্শ করে। তবে পরমাণু বিদ্যুৎ নিয়ে আজ যে গভীর সংশয় ও প্রশ্ন উঠে এসেছে, আপনাদের প্রদর্শনীতে তা বোধহয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দাবি করতে পারত। আজ অভিযোগ উঠছে, শক্তি সমস্যা সমাধানের জন্য নয়, পরমাণু চুল্লি বানানো হচ্ছে পরমাণু বোমার মশলা সংগ্রহের জন্য এবং কিছু বিজ্ঞানী-প্রযুক্তিবিদ-যন্ত্রাংশব্যবসায়ীর সংকীর্ণ স্বার্থে। আরও বলা হচ্ছে, স্রেফ বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করেই পরমাণু বিদ্যুতের চেয়ে বেশী বিদ্যুৎ পাওয়া সম্ভব। এসব নিয়ে আপনারা যদি ভাবনাচিন্তা করেন, তাতে বিজ্ঞান আন্দোলনের লাভ হবে।

তাড়াহুড়োয় সংগঠনের লেটারহেডে কম্পিউটারে টাইপ করা চিঠি দিতে পারলাম না, অনতিসুন্দর হস্তাক্ষর মার্জনা করবেন।

০৯/০৩/২০১৪

যুক্তিবাদী অভিনন্দন
দেবাশিস্ ভট্টাচার্য
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি
বরানগর, কলকাতা–৩৬

নিবন্ধ

পারমাণবিক শক্তি কি মানব কল্যাণের অন্তরায় ?

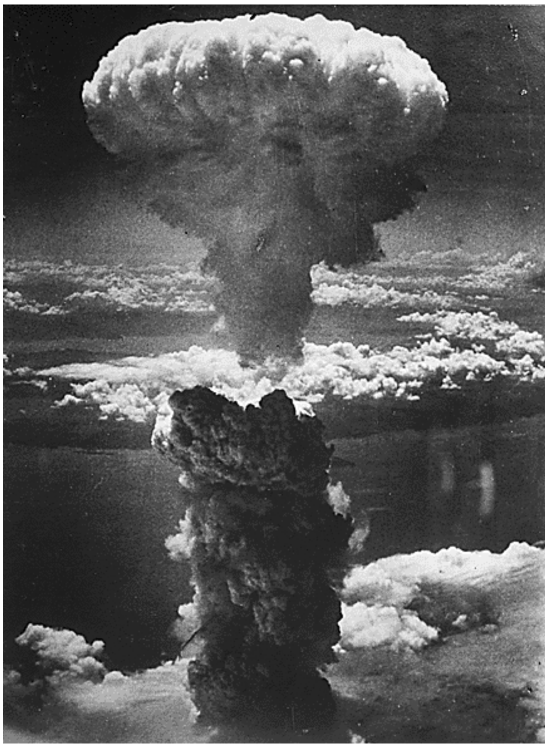

মানব সভ্যতায় সাধারণের কাছে "পারমাণবিক শক্তি"র আত্মপ্রকাশ যেভাবে ঘটেছে তা বিভীষিকাময়, দুঃখজনক এবং নিন্দনীয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ ঘন্টা যে এতটাই দীর্ঘস্থায়ী বিষাদময় হবে তা বিশ্ববাসীর বেশীরভাগের ধারণার বাইরে ছিল। ১৯৪৫ এর ৬ই আগস্ট হিরোশিমায় "লিটিল বয়" এবং ৯ই আগস্ট নাগাসাকিতে "ফ্যাট ম্যান"– পরমাণু বোমা-দুটি তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘস্থায়ীভাবে কয়েক লক্ষ মানুষ ও দুটি শহরের বেশীরভাগ সম্পদ নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, বিস্ফোরণের বহুদিন পরও তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব মানুষ সহ জীবজগতের উপর বিষময় প্রভাব জারী রেখেছে। পারমাণবিক শক্তির প্রথম প্রয়োগের উদাহরণ স্বাভাবিকভাবেই সাধারণের কাছে "পারমাণবিক শক্তি" সম্পর্কে আতঙ্ক সৃষ্টি হওয়ার জন্য যথেষ্ট। পরবর্তীতে "তিনমাইল" দ্বীপ, "চেরনোবিল" ও সম্প্রতি 'ফুকুসিমা-দাইচির" দুর্ঘটনা এবং ভারত সহ বিভিন্ন দেশে পরমাণু শক্তি উৎপাদন ক্ষেত্রের নিরাপত্তার অভাব ও তেজস্ক্রিয় বর্জ্য নিষ্ক্রমণের অবৈজ্ঞানিক ক্ষতিকারক পদ্ধতিকে উল্লেখ করে অনেকেই "পারমাণবিক শক্তি" উৎপাদনের বিরোধিতা করে আসছেন। তবে কি বিজ্ঞানের এই আবিষ্কার মানব জীবনে কল্যাণের বদলে ধ্বংসের বীজ পুঁতে ছিল? এই নিয়ে তথাকথিত শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমাজে সংশয় বিরাজ করছে। এই সংশয় কাটিয়ে সঠিক ধারণায় পৌঁছবার লক্ষ্যেই এই রচনা।

এই বিষয়টা বোঝার জন্য আমাদের জানা দরকার পারমাণবিক শক্তি কি? কিভাবে তা উৎপন্ন হয় ? জানা দরকার এই শক্তি পরমাণু বোমায় কিভাবে কাজ করে আর পারমাণবিক চুল্লিতে কিভাবে কাজ করে? জানা দরকার এই শক্তি মানব কল্যাণে ব্যবহার করা যায় বা হয় কিনা ? জানা দরকার এই শক্তির আত্মপ্রকাশ এত ভয়াবহ ছিল কেন ?

পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মোট ভর তার উপাদান নিউক্লিয়নগুলির ভরের যোগফলের চেয়ে সামান্য কম হয় – ভরের এই পার্থক্যকে **ভরহ্রাস (Mass defect)** বলা হয়। আবার কোন নিউক্লিয়াসের মধ্যে বদ্ধ নিউক্লিয়নগুলির মোটশক্তি, নিউক্লিয়াসের বাইরে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় নিউক্লিয়নগুলির শক্তির যোগফলের চেয়ে কম। শক্তির এই পার্থক্যকে নিউক্লিয়াসের বন্ধন শক্তি বলা হয়। ভর ও শক্তির তুল্যতা সূত্র থেকে জানা যায়, নিউক্লিয়াসের ভর হ্রাস নিউক্লিয়নগুলির মধ্যে বন্ধন শক্তি রূপে ক্রিয়াশীল থাকে। কোন নিউক্লিয়াস যখন নতুন নিউক্লিয়াস গঠন করে তখন প্রথম নিউক্লিয়াসের 'বন্ধন শক্তি' যা আসলে "ভরহ্রাস"-তাই শক্তি রূপে নির্গত হয় – এই হল পারমাণবিক শক্তি। পারমাণবিক শক্তি, **"নিউক্লিয়ার বিভাজন"** ও **"নিউক্লিয়ার সংযোজন"** –এই দুটি পদ্ধতিতে নির্গত হয়।

নিউক্লিয়ার বিভাজন ও চেন রিয়্যাকশন

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী অটোহান এবং স্ট্র্যাসম্যান, ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াসকে নিউট্রন দ্বারা আঘাত করে প্রায় সমভর ও প্রায় সমান আধান বিশিষ্ট দুটি খন্ডে বিভক্ত করেন।

ইউরেনিয়াম + নিউট্রন → বেরিয়াম + ক্রিপটন। এই পদ্ধতিতে কেবলমাত্র ${}_{92}U^{235}$ বিভাজন করা সম্ভব হয়েছিল।

নিউক্লিয় বিয়োজন

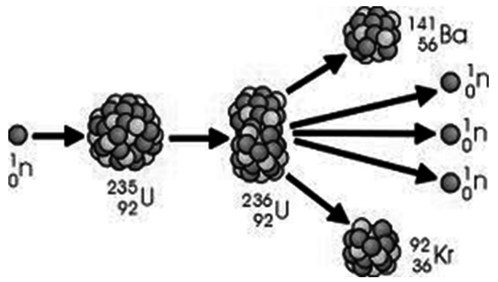

চিত্র ১

নিউক্লিয় সংযোজন

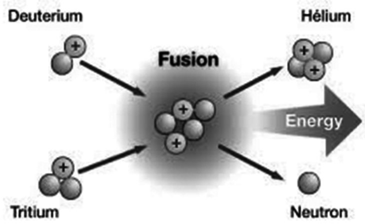

চিত্র ২

এই বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু সংখ্যক উচ্চগতি সম্পন্ন নিউট্রন নির্গত হয়। একে নিউক্লিয় বিভাজন বলা হয়। (চিত্র ১)

$$_{92}U^{235} + {}_0n^1 \rightarrow {}_{92}U^{236} \rightarrow {}_{56}Ba^{141} + {}_{36}Kr^{92} + 3{}_0n^1$$

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন $_{92}U^{235}$ এর সঙ্গে $_0n^1$ সংঘাতে প্রায় তিরিশ রকমের বিক্রিয়া হতে পারে, যার মধ্যে এটি একটি।

যেহেতু $_{92}U^{235}$ কে একটি নিউট্রন দ্বারা আঘাত করলে এর নিউক্লিয়াস থেকে একের অধিক নিউট্রন নির্গত হয়, সেহেতু চেন রিয়্যাকশন সম্ভব হয়। উচ্চ গতিশক্তি সম্পন্ন এই নিউট্রনগুলি অন্য ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াসের বিভাজন ঘটাতে পারে। কাজেই যথেষ্ট পরিমাণে ইউরেনিয়াম ($_{92}U^{235}$) মজুত থাকলে এবং একবার বিভাজন প্রক্রিয়া শুরু হলে তা অবিরাম চলতে থাকবে। প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলির ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চেন রিয়্যাকশন ঘটে না।

নিউক্লিয় সংযোজন

এই পদ্ধতিতে হাল্কা মৌলের পরমাণু যেমন হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াস যুক্ত হয়ে হিলিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াস গঠিত হয়। হাইড্রোজেনের ৪টি নিউক্লিয়াস অর্থাৎ ৪টি প্রোটন নিজেদের মধ্যে কুলম্বীয় বিকর্ষণ বল অতিক্রম করে হিলিয়াম নিউক্লিয়াসে পরিণত হতে যথেষ্ট গতিশীল হতে হয়। হাইড্রোজেন পরমাণুগুলিকে উপযুক্ত মাত্রায় গতিশীল করতে প্রাথমিকভাবে প্রচুর শক্তির প্রয়োজন হয়। তাই নিউক্লিয় সংযোজন [চিত্র ২] পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে শক্তি উৎপাদন করা এখনও সম্ভব হয় নি। সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্র থেকে নির্গত শক্তি প্রকৃতপক্ষে হিলিয়ামের বন্ধন শক্তি।

এই দুই পদ্ধতিতে উৎপন্ন আইসোটোপগুলি প্রাথমিকভাবে তেজস্ক্রিয় হয়। ফলে তাদের অর্ধায়ু অনুযায়ী তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হয়। ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িৎ ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে, তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত রশ্মি তিনটি অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। এ থেকে রাদারফোর্ড সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে কিছু রশ্মি ধনাত্মক তড়িৎগ্রস্থ (α - রশ্মি), কিছু রশ্মি ঋণাত্মক তড়িৎগ্রস্থ (β রশ্মি) এবং অবশিষ্ট রশ্মি নিস্তড়িৎ (γ রশ্মি)। চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতেও এই পরীক্ষা সফলভাবে প্রমাণিত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে জানা গেছে যে, α -কণা প্রকৃতপক্ষে হিলিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াস। β রশ্মি প্রকৃতপক্ষে ইলেকট্রনের স্রোত। আরও পরে আবিষ্কার হয়েছে β কণা পজিট্রনও হতে পারে – যা ইলেকট্রনের অ্যান্টিপার্টিকেল। γ - রশ্মি তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ। γ - রশ্মিকে উচ্চশক্তির ফোটনের স্রোত রূপেও বর্ণনা করা যায়। নিউক্লিয়াস থেকে একটি α বা β কণা নিঃসরণের পর নিউক্লিয়াস উদ্দীপিত অবস্থায় থাকে। নিউক্লিয়াসটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার সময় অতিরিক্ত শক্তি γ - রশ্মিরূপে নিঃসারিত হয়।

পরমাণু বোমার যে শক্তি অনিয়ন্ত্রিতভাবে উৎপন্ন ও নির্গত হয় নিউক্লিয় রিয়্যাকটরে সেই শক্তিই নিয়ন্ত্রিতভাবে উৎপাদন করা হয়। পরমাণু বোমা ও নিউক্লিয়ার রিয়্যাকটর – দু ক্ষেত্রেই নিউক্লিয় বিভাজন প্রক্রিয়ায় চেন রিয়্যাকশন ঘটে। প্রমাণ করা গেছে যে একটি নিউক্লিয়াস বিভাজনের ফলে মুক্ত নিউট্রন

10^{-9} সেকেন্ডের মধ্যে পরবর্তী নিউক্লিয়াসকে আঘাত করে। নিউক্লিয়ার রিয়্যাকটরে চেন রিয়্যাকশনের গতিশীল পথের প্রতি ধাপে নির্দিষ্ট সংখ্যক নিউট্রনকে ক্যাডমিয়াম দ্বারা শোষণ করে নেওয়া হয়। ফলে শুধুমাত্র অবশিষ্ট সংখ্যক নিউট্রনের পক্ষেই পরবর্তী সীমিত সংখ্যক নিউক্লিয়াসকে আঘাত করা সম্ভব হয়। এই নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়া ধারাবাহিক কিন্তু এর দ্বারা উৎপাদিত শক্তি ক্রমবর্ধমান নয়। পরমাণু বোমায় এই প্রক্রিয়া অনিয়ন্ত্রিত এবং ক্রমবর্ধমান। নিউক্লিয় রিয়্যাকটরে পরমাণু শক্তি উৎপাদনের পরে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ যুক্ত বর্জ্য পদার্থকে বৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিকারক প্রভাবকে নূন্যতম করা সম্ভব – যা পরমাণু বোমার ক্ষেত্রে একেবারেই অসম্ভব। নিউক্লিয় সংযোজন পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে এখনও পর্যন্ত ঘটান সম্ভব হয় নি – শুধুমাত্র অনিয়ন্ত্রিত উপায়ের হাইড্রোজেন বোমা বানানো সম্ভব হয়েছে।

পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতি

পারমাণবিক চুল্লিতে চেন্ রিয়্যাকশনে উৎপন্ন উচ্চগতির নিউট্রনগুলিকে মন্দিভূত করার জন্য ভারীজল বা গ্রাফাইট ব্যবহার করা হয়–যাদের মন্দক (moderator) বলা হয়। **মন্দক নিউট্রন শোষণ করে না, নিউট্রনের শক্তি শোষণ করে।** এই মন্দক নিউট্রনগুলিই $_{92}U^{235}$ দ্বারা আত্তিকরণ এবং পরবর্তীতে এই $_{92}U^{236}$ বিভাজন সম্ভব হয়। চুল্লিতে একটি তাপরোধক পাত্রে মন্দক ভরে তার মধ্যে জ্বালানি দন্ড এমনভাবে সাজান হয় যাতে পরপর দুটি জ্বালানি দন্ডের দূরত্ব এমন হয় যাতে দ্রুত নিউট্রনগুলি গতি হারিয়ে তাপীয় নিউট্রনে পরিণত হতে পারে। বস্তুত ইউরেনিয়ামকে ছোট ছোট ধাতব পাত্রে ভরে- ঐ পাত্রগুলিকে ইস্পাতের চোঙের মধ্যে ভরে জ্বালানি দন্ড তৈরী করা হয়। [চিত্র ৩]

চুল্লিতে শৃঙ্খল বিক্রিয়ার যে কোন চক্রের শেষে ও শুরুতে নিউট্রন সংখ্যার অনুপাত (k) যাকে পরিবর্ধন গুণক (multiplication factor) বলা হয় তা একটি গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়। এই গুণকের মান এর উপর নির্ভর ক'রে চুল্লির তিনটি অবস্থা হতে পারে–

(ক) Critical অবস্থা – যখন $k=1$ হয়, এক্ষেত্রে চুল্লিতে নিউট্রনের সংখ্যা সময়ের সঙ্গে অপরিবর্তিত থাকে। ফলে কম অথচ একই হারে শক্তি উৎপাদন হয় এবং ঐ শক্তিকে একই হারে উচ্চচাপযুক্ত জল বা গ্যাসের সাহায্যে চাপরোধক পাত্রের বাইরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

(খ) Super critical অবস্থা – যখন $k\rangle 1$, এক্ষেত্রে শক্তি উৎপাদনের হার সময়ের সঙ্গে বাড়তে থাকে - এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাপ সঞ্চালন সম্ভব হয় না – ফলে চুল্লিটি গলে যাবার সম্ভাবনা তৈরী হয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও পারমাণবিক বোমার মতন বিস্ফোরণ ঘটনার সম্ভাবনা থাকে না – কারণ মূল জ্বালানি – পরমাণু বোমায় ব্যবহৃত বিশুদ্ধ $_{92}U^{235}$ নয় – বরঞ্চ

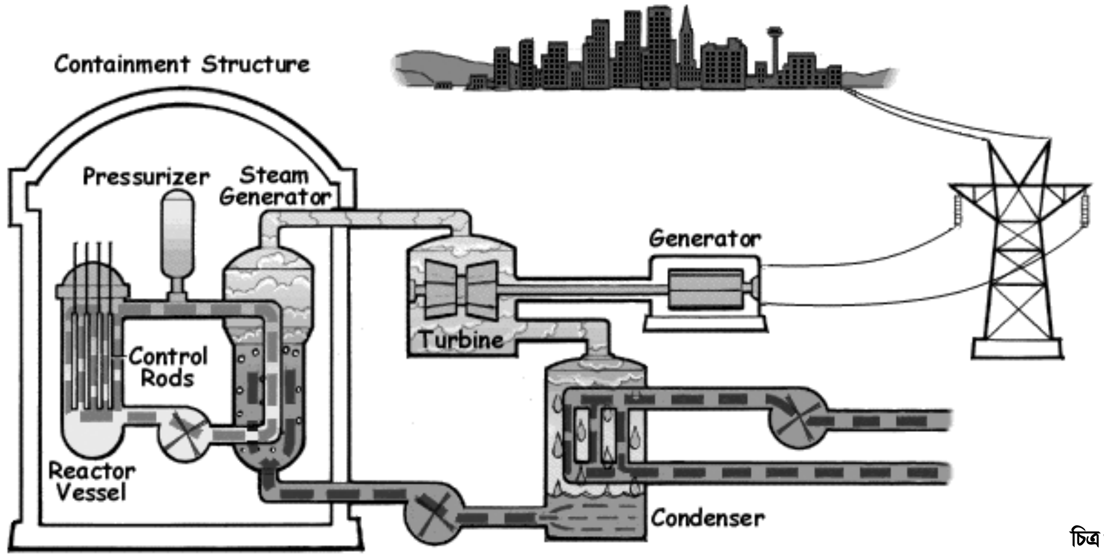

চিত্র ৩

বেশীরভাগই $_{92}U^{238}$ যা বিভাজনযোগ্য নয়।

(গ) Subcritical অবস্থা – যখন $k\langle 1$ হয়। এই অবস্থায় চুল্লিতে শক্তি উৎপাদনের হার ক্রমশ কমতে থাকে। $k=0$ হলে চুল্লিটি নিভে যায়।

k-এর মান অর্থাৎ নিউট্রনের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে ক্যাডমিয়ামের এক সেট নিয়ন্ত্রক দন্ড (control rod) ব্যবহার করা হয়। চাপরোধক পাত্রে মন্দকের মধ্যে, জ্বালানি দন্ডগুলির অন্তবর্তী ফাঁকে এই কন্ট্রোল রড ঢুকিয়ে নিউট্রন শোষণ করা হয়। এই কন্ট্রোল রডগুলিকে উঠিয়ে নামিয়ে চেন্ রিয়্যাকশন নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

নিয়ন্ত্রণ দন্ড ছাড়াও চুল্লিতে অতিরিক্ত এক সেট ক্যাডমিয়াম দন্ড থাকে – এগুলিকে নিরাপত্তা দন্ড (সেফটি রড) বলা হয়। জরুরিকালীন অবস্থায় এগুলিকে ব্যবহার করে k-এর মান 1-এর নিচে নামান হয় – অর্থাৎ চুল্লিকে বিপদমুক্ত করা হয়।

চাপরোধক পাত্র থেকে, তেজস্ক্রিয় বিকিরণের হাত থেকে কর্মীদের রক্ষা করার জন্য-চাপরোধক পাত্রটিকে মাটির নীচে মোটা কংক্রিটের প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রাখা হয়।

চুল্লিতে উৎপন্ন শক্তি তথা তাপকে উচ্চ চাপ যুক্ত জল বা কোন সঞ্চালন মাধ্যম দ্বারা চুল্লির বাইরে এনে তাপ বিনিময় ব্যবস্থার সাহায্যে ঐ তাপ নিষ্কাশন ক'রে জল ফুটিয়ে স্টীম তৈরী করা হয়। ঐ স্টীমের সাহায্যেই টারবাইন ঘুরিয়ে জেনারেটরে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা হয়।

পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনে প্রকৃত সমস্যা

এক্ষেত্রে প্রকৃত সমস্যাগুলি হল ঃ

(১) খনি থেকে প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় মৌল (ইউরেনিয়াম) উত্তোলন। এই ধরনের খনিতে কর্মরত শ্রমিকদের তেজস্ক্রিয় বিকিরণের শিকার হতে হয়। এর থেকে শ্রমিকদের রক্ষা পেতে শ্রমিকদের উপযুক্ত মানের তেজস্ক্রিয় প্রতিরোধক পোষাক ব্যবহার করার ব্যবস্থা প্রয়োজন। এসব ক্ষেত্রে শ্রম-সময়, সাধারণ কর্মক্ষেত্র অপেক্ষা যথেষ্ট কম হওয়া প্রয়োজন।

(২) শক্তি উৎপাদন ক্ষেত্রের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কাঁচা মাল যেমন ইউরেনিয়াম ও নিউক্লিয়ার রিয়্যাকটরের বিকিরণ এবং বর্জ্য পদার্থে উপস্থিত কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় মৌলের বিকিরণ – সব মিলিয়ে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। এক্ষেত্রে রিয়্যাকটরের বিকিরণ হ্রাস করার ব্যবস্থা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে এর জন্য কতকগুলি ভৌত ও রাসায়নিক ব্যবস্থা আবিষ্কার হয়েছে। রিয়্যাকটর ও কর্মচারিদের কাজের এলাকার মধ্যে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে তার মধ্যে মধ্যে ভৌত বাধা দান করার ব্যবস্থা আবিষ্কার হয়েছে। রিয়্যাকটরের তেজস্ক্রিয় বিকিরণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা হয় - কর্মীদের উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে বসিয়ে রিমোট কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট দ্বারা। চূড়ান্ত নিরাপত্তার জন্য 'defence in depth' approach নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রেও একান্তভাবে প্রয়োজন 'শ্রম-সময়' হ্রাস করা।

(৩) বর্জ্য পদার্থ নিস্ক্রমণ – তেজস্ক্রিয় মৌল যুক্ত বর্জ্য পদার্থ্য সঠিকভাবে নিস্ক্রমণ করতে না পারলে - তা নানাবিধ সমস্যার কারণ হতে পারে। প্রাথমিকভাবে জনবসতিহীন এলাকায় মাটির তলায় সীসার বাক্স বন্ধি করে মাটির নীচে পুঁতে দেওয়া হত। কিন্তু দেখা গেছে এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। বর্তমানে বিজ্ঞানীদের মত হল–

(ক) পৃথিবীর কক্ষপথের বাইরে মহাশূন্যে - রকেটের মাধ্যমে এই বর্জ্য নিক্ষেপ করা। বর্তমানে এই পদ্ধতি প্রচুর ব্যয়বহুল হওয়ায় তা লাগু হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

(খ) সমুদ্রের তলায়, লিথোস্ফিয়ারিক প্লেট সীমান্তের সাবডাকশন জোনে সাবডাকটিং প্লেটের উপর গর্ত খুঁড়ে তেজস্ক্রিয় বর্জ্যকে নিক্ষেপ করা – যা ধীরে ধীরে (বছরে প্রায় ৫-১০মিলি মিটার) পৃথিবীর গুরুমন্ডলে (mantle) মিশে যাবে। এই পদ্ধতিতে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট তেজস্ক্রিয় মৌল আবার প্রকৃতিতে ফিরে যায়। এই পদ্ধতি প্রথম পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক কম খরচের।

তেজস্ক্রিয় বর্জ্য নিস্ক্রমণের এই দুটি পদ্ধতিই মানব সভ্যতার উপর এর ক্ষতিকারক প্রভাবকে প্রায় শূন্যে পৌঁছে দিতে পারে। কিন্তু বাস্তবে বর্তমানে ভারতমহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর ও অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের যত্রতত্র এই বর্জ্যপদার্থ নিক্ষেপ করা হচ্ছে। পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের সাথে সাথে উৎপন্ন বর্জ্য পদার্থে উপস্থিত তেজস্ক্রিয় আইসোটোপগুলি যা প্রকৃতিতে ছিল না কৃত্রিমভাবে সংযোজিত হচ্ছে। এর প্রভাবে সমুদ্রের তাপমাত্রা বৃদ্ধির পাশাপাশি সামুদ্রিক জীবজগতের প্রবল ক্ষতিসাধন হচ্ছে, অপ্রাকৃতিক কারণে জৈব বৈচিত্র নষ্ট হচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হল বর্জ্য পদার্থ নিস্ক্রমণের সঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কার সত্ত্বেও পরমাণু বর্জ্য অবৈজ্ঞানিকভাবে ডাম্পিং করা হচ্ছে কেন? এর একমাত্র কারণ হল – পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির (এদেশে এবং বিদেশে)–তা সরকারী হোক অথবা প্রাইভেট লক্ষ্য মানব কল্যাণ নয়; উৎপন্ন

বিদ্যুৎশক্তি বিক্রি করে মুনাফা করা। এর ক্ষতিকারক দিক নিয়ে তারা চিন্তিত নয়। একমাত্র এর ক্ষতিকারক দিক নিয়ে জন আন্দোলন হলেই তারা একটু নড়ে চড়ে বসে, আবার যে কে সেই! প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, শুধু পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে নয় সকল ধরণের বিদ্যুৎ এবং শিল্প-কৃষি উৎপাদনের সময় পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বিনিয়োগকারীদের লক্ষ্য একই থাকে-মুনাফা, মানব কল্যাণ নয়।

বিদ্যুৎ উৎপাদন ছাড়া পরমাণু শক্তি এবং কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় আইসোটোপগুলির ব্যবহার

১) চিকিৎসা ক্ষেত্রে

আমরা অনেকেই চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিকিরণ ও তেজস্ক্রীয় আইসোটোপের বহুল ব্যবহার সম্পর্কে অবগত। প্রধানত : ডায়াগনোসিস (রোগ নির্ণয়) এবং থেরাপি (চিকিৎসায়)-এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। উন্নত দেশগুলিতে (বিশ্বের জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ) রোগনির্ণয়ে প্রতিবছর ১.৯% জনসংখ্যার ক্ষেত্রে নিউক্লিয়ার মেডিসিন ব্যবহার করা হয়। এবং তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয় এদের এক দশমাংশ।

বিশ্বব্যাপী ১০,০০০ এর বেশি হসপিটালে চিকিৎসায় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহৃত হয়। ইউ এস এ-তে ৩১১ মিলিয়ন মানুষের মধ্যে প্রতিবছর ১৮ মিলিয়নকে নিউক্লিয়ার চিকিৎসা পদ্ধতি দেওয়া হয়। ইউরোপে সংখ্যাটা ৫০০ মিলিয়নে ১০ মিলিয়ন। প্রতিবছর রোগ নির্ণয়ে তেজস্ক্রিয়-চিকিৎসা-ড্রাগের ব্যবহার বাড়ছে ১০%।

রোগ নির্ণয় ঃ- রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসার ক্ষেত্রে রেডিওআইসোটোপ একটি অতি প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিচ্ছবি ধারক যন্ত্র (imaging device) যেটা নিজে থেকে গামা রশ্মি নিঃস্বরন এবং তার লিপিবদ্ধকরণের মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন অংশের চলমান পদ্ধতিগুলি পর্যবেক্ষণ করতে পারে। 'x-ray-র থেকে নিউক্লীয় প্রযুক্তি/কৌশল ব্যবহারের সুবিধা হল, এটি অস্থি এবং কোমল কলা (soft tissue) উভয়েরই প্রতিচ্ছবি খুব নিখুঁতভাবে নিতে পারে।

Radiopharmaceuticals ব্যবহার করে রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে রুগীকে একটি তেজস্ক্রিয় ডোজ দেওয়া হয়। তার পর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সক্রিয়তা পর্যবেক্ষণ করা হয়। এটা করা হয় দ্বিমাত্রিক ছবির অথবা tomography নামক একটি প্রযুক্তি দ্বারা যেখানে ত্রিমাত্রিক ছবি পাওয়া যায়।

রেডিও আইসোটোপের অন্য প্রধান ব্যবহার হল পরীক্ষাগারে জৈব-রাসায়নিক বিশ্লেষনের জন্য তেজস্ক্রিয় বিশুদ্ধি করণ পরীক্ষায় (radio-immuno-assays) অতি কম ঘনত্বের হরমোন, এনজাইম, হেপাটাইটিস ভাইরাস, কিছু ড্রাগ এবং রুগীর রক্তের নমুনায় অন্যান্য বস্তুর চলাচল – পরিমাপের জন্য এটা ব্যবহার করা হয়। পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত রেডিও আইসোটোপ কখনো রুগীর সংস্পর্শে আসে না। হিসেব করে দেখা যায় কেবল ইউ এস এ-তেই প্রতিবছর ৪০ মিলিয়ন এরূপ পরীক্ষা করা হয়। ইউরোপে করা হয় ১৫ মিলিয়ন।

* কিডনীর রোগ নির্ণয় – Na - 24 ব্যবহৃত হয়।
* রক্তের রোগ নির্ণয় – P - 32, Cr - 51 ব্যবহৃত হয়।

চিকিৎসায় :- (Therapy)

থেরাপিতে রেডিও আইসোটোপের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম হলেও গুরুত্বপূর্ণ। রেডিয়েশনের মাধ্যমে Cancerous growths ধ্বংস করা হয়। এটা কোবাল্ট ৬০ থেকে নির্গত গামা রশ্মি ব্যবহার করে বাইরে থেকে করা যায়। আবার স্বল্প গামা বা বিটা radiation উৎস শরীরের অভ্যন্তরে ব্যবহার করেও করা যায়।

Iodine - 131 সাধারণত থাইরয়েড ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। এটা সম্ভবতঃ ক্যান্সার চিকিৎসার সর্বাধিক সফল পদ্ধতি এবং মারাত্মক নয়। Iridium - 192 wire implants ব্যবহার করা হয় বিশেষতঃ মস্তিষ্ক ও স্তনের সীমিত জায়গায় বিটা রশ্মির যথাযথ ডোজ দিতে। পরে এই implant তুলে নেওয়া হয়। অস্থির সেকেন্ডারী ক্যান্সারের ব্যথা যন্ত্রণা নিরাময়ের জন্য একটি নতুন চিকিৎসা পদ্ধতিতে organic phosphate সহযোগে Samarium -153 মিশ্রন ব্যবহার করা হয়।

* লিউকোমিয়া, ব্রেনটিউমার চিকিৎসায় – P - 32
* গলগন্ড – I - 131 *চর্মরোগ - P - 30 ব্যবহৃত হয়।
* পারমানবিক শক্তিচালিত পেসমেকার
* কৃত্রিম হৃদযন্ত্র তৈরীতে – প্লুটোনিয়াম – 239 এর ব্যবহার হয়।

জীবাণু মুক্ত করণ ঃ অনেক মেডিকাল প্রোডাক্ট আজকাল cobalt - 60 নির্গত গামা রশ্মি দ্বারা জীবাণুমুক্ত করা হয়। এই প্রযুক্তি সাধারণত বাষ্প-তাপ-বিশুদ্ধিকরণের থেকে অনেক বেশি কার্যকরী। গামা রশ্মি দিয়ে জীবাণুমুক্ত করণের একটি উদাহরণ disposal সিরিঞ্জ। তাপ সংবেদনশীল বস্তু যেমন – powders, ointments, solution এবং জৈবিক প্রস্তুতি (preperations) যেমন- bone, nerve, skin ইত্যাদি যেগুলি টিসু গ্রাফটে ব্যবহার হয় - এগুলিকে জীবাণুমুক্ত করতে "শীতল" পদ্ধতির বিকিরণ কাজে লাগান হয়।

বিকিরণের মাধ্যমে জীবাণুমুক্তকরণে মানবজাতি প্রভূত উপকৃত হয়েছে। এটা নিরাপদ, কারণ বস্তুকে প্যাকেটজাত করার পরও এটা করা যেতে পারে। সিরিঞ্জ ছাড়াও বিভিন্ন মেডিক্যাল প্রোডাকটস যেমন - cotton, wool, burn dressings, surgical gloves, heart valves, bandages, plastic, rubbar sheets এবং surgical instruments প্রভৃতি বিকিরণ পদ্ধতিতে জীবাণুমুক্ত করা হয়।

২) **কৃষিক্ষেত্রে**

সার ঃ সার সঠিকভাবে ব্যবহার না করলে পরিবেশের ক্ষতি হতে পারে। গাছের/উদ্ভিদের জন্য কি পরিমান সার দরকার এবং পরিবেশে সেটা নূন্যতম কতটা নষ্ট হয় এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

নাইট্রোজেন-১৫ এবং ফসফরাস-৩২ নামাঙ্কিত সারগুলি নির্দেশ করে, গাছ কি পরিমানে এটা গ্রহণ করতে পারে এবং কতটা নষ্ট হয়। নাইট্রোজেন-১৫ এও ধারণা দেয় যে, মাটি কি পরিমান নাইট্রোজেন বায়ু থেকে জমা করবে এবং সিম্বগোত্রীয় উদ্ভিদের (legumes) মূল ব্যাক্টেরিয়ার দ্বারা।

জিনগত বৈচিত্র্য বৃদ্ধি ঃ কয়েক দশক ধরে plant breeding - এ মিউটেশনের জন্য (ionising radiation) আয়নী তেজস্ক্রিয়তা কাজে লাগানো হচ্ছে। এভাবে ১৮০০ প্রজাতির শস্য উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। নতুন জিনগত root and tuber crops, cereals and oil seed crops উৎপাদনে গামা বা নিউট্রন বিকিরণ (irradiation) অন্যান্য প্রযুক্তির সাথে প্রায়ই ব্যবহার করা হয়।

এই নতুন ধরনের জোয়ান, আদা, গম, কলা, বিন (beans) এবং লঙ্কা অধিকতর কীটপতঙ্গ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন। এবং এরা রুক্ষ পরিবেশে অধিকতর সহজে মানিয়ে নিতে পারে। মালিতে জোয়ান ও ধানের বীজের irradiation - দ্বারা অধিকতর ফলনশীল ও বৈচিত্র্যময় করা সম্ভব হয়েছে।

পতঙ্গ দমন ঃ পতঙ্গের/কীটের দ্বারা সারা বিশ্বে মজুদজাত ফসলের ১০% এর বেশি নষ্ট হয়। উন্নত দেশে সংখ্যাটা ২৫-৩০%। টিসেটসি (tsetse) দ্বারা আফ্রিকার এবং স্ক্রুওয়ার্ম দ্বারা মেক্সিকোয় প্রচুর ফসল নষ্ট হত। এই ক্ষতির পরিমান কমাতে বহু বছর ধরে রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার হয়ে আসছিলো। কিন্তু এগুলো সর্বদা কার্যকরী হয়নি। সমাধান হল নির্বীজিত পতঙ্গ (sterile insects) ব্যবহার করা।

পতঙ্গের ডিমগুলিকে বাচ্চা ফুটে বেড়োনোর আগেই গামা বিকিরণের মাধ্যমে নির্বীজিত করা হয়। উপদ্রুত অঞ্চলে এভাবে প্রচুর সংখ্যায় নির্বীজিত পুরুষ পতঙ্গের জন্ম হয়। তখন তারা মেয়ে পতঙ্গের সাথে মিলিত হলেও অপত্যের জন্ম হতে পারে না। এভাবে নির্বীজিত পুরুষ পতঙ্গের পরস্পর উৎপাদনে প্রকল্পিত অঞ্চলে (projcet area) ক্ষতিকারক পতঙ্গের সংখ্যা মারাত্মক কমে গেছে।

খাদ্য সংরক্ষণ ঃ অনেক দেশেই মজুতজাত ফসলের ২৫-৩০% এর মত নষ্ট হয়ে যায় বিভিন্ন জীবাণু (microbes) এবং ক্ষতিকর কীটের আক্রমণে। কীটের আক্রমণ এবং দূষনের জন্য যে নষ্টের পরিমাণ, তাকে কমানো হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। যেসব দেশে গরম ও আর্দ্র জলবায়ু সেখানে বিশেষতঃ এরূপ অবস্থা। কতিপয় খাদ্যের সংরক্ষণ কাল মাত্র কয়েকদিন বাড়ালেই এগুলি ব্যবহারের পূর্বে অপচয়ের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য যথেষ্ট।

পৃথিবীর সর্বত্রই খাদ্য সংরক্ষণের জন্য বিকিরণ প্রযুক্তির (irradiation technology) ব্যবহার বেড়ে চলেছে। ৪০ টিরও বেশি দেশের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ ৬০ প্রকারেরও বেশি খাদ্যের জন্য irradiation কে সমর্থন করছে। শুষ্ক ফল এবং শস্য, শুঁটী এবং মসলা থেকে ক্ষতিকর কীট নির্মূল করতে অত্যন্ত ক্ষতিকর রাসায়নিক ধোঁয়া/বাষ্পের পরিবর্তে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ (irraoliation) ব্যবহার করা শ্রেয়।

ফসল মজুতজাত করার পর অপচয় কমার সাথে সাথে খাদ্যবাহিত রোগ সম্বন্ধীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি খাদ্যে

তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ব্যবহার বাড়িয়ে নিচ্ছে। এবং আহার্য সামগ্রীর গুণগত উৎকর্ষতায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বাড়ছে। নভোচারীরা তাদের মহাকাশ অভিযানকালে এই তেজস্ক্রীয় বিকিরণের সংরক্ষিত খাদ্যই খায়।

Food irradiation হল, উচ্চ স্তরের গামা বিকিরণে কাঁচা খাবারকে উন্মুক্ত করা। এতে খাদ্যের পুষ্টিগুণকে প্রভাবিত না করে অথবা কোন বর্জ্য না জমিয়ে খাদ্যের ব্যাক্টেরিয়া ও অন্যান্য ক্ষতিকারক জীবাণু মেরে ফেলে। কাঁচা এবং জমানো খাদ্যে ব্যাক্টেরীয় (pathogens) রোগসৃষ্টিকারীকে মারার এটাই একমাত্র উপায়। **নিশ্চিতভাবে বলা যায়, খাদ্যে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ খাদ্যকে তেজস্ক্রিয় করে না।**

৩) শিল্প ক্ষেত্রে

পরিবেশগত সন্ধানী ঃ দূষক পদার্থকে নির্ণয় ও বিশ্লেষণ করতেও রেডিও আইসোটোপ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। কারণ এমনকি অতি সামান্য রেডিও আইসোটোপকেও সহজে চিহ্নিত করা যায়। এবং স্বল্পায়ু আইসোটোপের কোনও অবশেষ পরিবেশে জমে না।

শিল্পীয় সন্ধানী (Industrial tracers) ঃ অতি সামান্য পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা নির্ণয়ের ক্ষমতার জন্য শিল্পক্ষেত্রে রেডিওআইসোটোপগুলির 'সন্ধানী' হিসেবে ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত মেটেরিয়ালের সাথে সামান্য পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ মিশিয়ে সেই মিশেলের (the mixing) এবং, তরল, পাউডার ও গ্যাস সহ সে মেটেরিয়ালের প্রবাহ হার পর্যবেক্ষণ করা এবং ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করা সম্ভব হয়।

লুব্রিকেটিং তেলের সাথে তেজস্ক্রিয় সন্ধানী মিশিয়ে ইঞ্জিন এবং উৎপাদনের যন্ত্রপাতির ক্ষয়ের হার নির্ণয় করা যায়। যন্ত্রাদির পারফরমেন্স পরীক্ষা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি, ফলস্বরূপ শক্তি সঞ্চয়ে ও কাঁচামালের অধিকতর ভাল ব্যবহারের ক্ষেত্রে সন্ধানী প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।

যন্ত্রপাতি ঃ প্রত্যেক শিল্প কারখানায় পরিমাপক যন্ত্রে তেজস্ক্রিয় উৎস ব্যবহার বহুল পরিমাণে হয়। এর দ্বারা গ্যাস, তরল ও কঠিন পদার্থের স্তর পরীক্ষা করা হয়। এই পরিমাপক যন্ত্রগুলি অত্যন্ত কার্যকরী যেখানে তাপ, চাপ বা ক্ষয়িষ্ণু পদার্থ যেমন গলিত কাঁচ বা গলিত ধাতু সরাসরি পরিমাপক যন্ত্রের সংস্পর্শে আনা কঠিন বা আদৌ আনা সম্ভব নয়।

পেপার, প্লাস্টিক ফিল্ম, ধাতু, কাঁচ প্রভৃতির দীর্ঘ পাত বানাতে যখন মাপযন্ত্র এবং বস্তুর পারস্পারিক সংস্পর্শে আসাকে পরিহার করার প্রয়োজন হয় তখন Radioisotope thickness gauges ব্যবহার করা হয়।

ডেনসিটি gauge ব্যবহার হয়, যখন তরল, পাউডার বা কঠিন পদার্থে পারমাণবিক নিয়ন্ত্রণ গুরুত্বপূর্ণ হয়। উদাহরণ স্বরূপ ডিটারজেন্ট প্রস্তুতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

রেডিওগ্রাফি ঃ রেডিওআইসোটোপ যেগুলি গামা রশ্মি নিঃসরণ করে সেগুলি এক্স-রে মেশিনের থেকে সহজে স্থানান্ত করণ যোগ্য এবং উচ্চ মানের বিকিরণ ক্ষমতাসম্পন্ন। তাই তাদের (নতুন) তৈরী গ্যাস ও তেলের পাইপলাইনের ঢালাই চেকিং-এ ব্যবহার করা হয়। এটা করা হয় পাইপের ভিতরে তেজস্ক্রিয় উৎস রেখে এবং ঢালাই-এর বাইরে ফিল্ম রেখে।

রেডিওগ্রাফির অন্যান্য গঠনগুলি (neutron radiography/ autoradiography) বিভিন্ন কার্যনীতির ভিত্তিতে পদার্থের বেধ ও ঘনত্ব পরিমাপ করতে অথবা যেসব উপাদানকে অন্য উপায়ে দেখতে পাওয়া যায় না তাদের চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়।

৪) গবেষণাক্ষেত্রে

জলসম্পদ ঃ আইসোটোপ হাইড্রোলজি টেকনিক ভূগর্ভস্থ জল সম্পদের ব্যাপ্তির সঠিক সন্ধান ও পরিমাপ করতে পারে। বিদ্যমান জল সরবরাহ এবং নতুন ও নবীকরণযোগ্য জল-উৎস নির্ণয় করে ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে এ কৌশল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণী হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। এটা উৎপত্তি, বয়স, ভুগর্ভস্থ জল বন্টন এবং ভূগর্ভস্থ ও উন্মুক্ত জলের (গ্রাউন্ড অ্যান্ড সার্ফেস ওয়াটার) মধ্যে সংযোগ এবং জলাধার (অ্যাকুইফার) রিচার্জ (পূর্ণ করা) পদ্ধতি সম্পর্কিত নানা প্রশ্নের উত্তর দেয়। সে ফলাফল জল সম্পদের sustainable ব্যবস্থাপনার জন্য নকশা বানাতে সাহায্য করে।

ভূপৃষ্ঠস্থ জলের ক্ষেত্রে ঃ এ কৌশল বাঁধ ও জলসেচ নালার ছিদ্র হ্রাস ও জলাধারের গতিশীলতা, প্রবাহ হার, নদী ভরাট

এবং অধক্ষেপের (sedimentation) / পলির হার সম্পর্কিত তথ্য দিতে পারে। আফগানিস্তান থেকে জাইরে, উন্নত ও উন্নয়নশীল মিলিয়ে ৬০টির মত দেশ আছে, যারা তাদের জল সম্পদ পর্যবেক্ষণের জন্য এই টেকনিক কাজে লাগাচ্ছে।

নিউট্রন প্রোবস খুব সঠিকভাবে মাটির আর্দ্রতা পরিমাপ করতে পারে। এর ফলে বিশেষ করে কৃষি ভূমি যেটা লবনাক্ত তার ব্যবস্থাপনা সম্ভব হয়।

রেডিও আইসোটোপ শক্তি উৎস ঃ

কিছু রেডিওআইসোটোপ যখন তাদের ক্ষয়প্রাপ্তি হতে থাকে তখন প্রচুর শক্তি নির্গত করে। এই শক্তি হার্ট পেসমেকার-এ, সমুদ্র যাত্রায় আলোক সংকেতে এবং কৃত্রিম উপগ্রহে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্লুটোনিয়াম ২৩৮-এর তাপ ক্ষরণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক মহাকাশ যানে শক্তির যোগান দিচ্ছে। এটা ক্যাসিনি স্পেস প্রোব-এর শনিগ্রহে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় শক্তি যোগাচ্ছে এবং এটা মার্স সায়েন্স ল্যাবরেটরিতেও শক্তি সরবরাহ করছে।

বয়স নির্ণয় (ডেটিং)

রেডিওআইসোটোপ বিশ্লেষণের অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে পাথর ও অন্যান্য পদার্থের বয়স নির্ণয় করতে। এটা ভূতত্ত্ববিদ, নৃতত্ত্ববিদ ও প্রত্নতত্ত্ব বিদদের গবেষণার ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ।

সমগ্র আলোচনা থেকে উঠে আসে যে, পারমাণবিক শক্তি মানব সমাজে শুধু ক্ষতিই করে নি, অনেক উপকারও করেছে। দেখা গেল নাগাসাকিতে প্লুটোনিয়াম-২৩৯ নির্মিত, "ফ্যাটম্যান" যে অপরিসিম ক্ষতি সাধান করেছে, সেই প্লুটোনিয়াম-২৩৯ কৃত্রিম হৃদ্‌যন্ত্রের চালিকাশক্তি। সুতরাং কি উদ্দেশ্যে পারমাণবিক শক্তি ও কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের উৎপাদন ও ব্যবহার হচ্ছে সেটাই বিচার্য্য বিষয়। চিকিৎসাবিদ্যায় বহু জীবনদায়ী ঔষধ অপব্যবহারের ফলে জীবন নাশও হতে পারে। ঘুমের ঔষধ যেমন ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ প্রয়োজনীয় তেমনি কখনো কখনো তা আত্মহত্যার উপায় হয়ে ওঠে। শল্য চিকিৎসার পূর্বে চেতনা নাশক রূপে যে মরফিন ব্যবহার করা হয় – সেই মরফিনের অপব্যবহারে মৃত্যু অনিবার্য। কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত কীটনাশক যেমন কীটের হাত থেকে ফলনকে রক্ষা করে - তেমনি এই কীটনাশক ক্ষেত্রবিশেষে আত্মহত্যার উপায় হয়ে ওঠে। এরকম আরও কত কি না আছে। ব্যবহারের উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিমান তথা মাত্রা নির্ধারিত হয়।

পরমাণু শক্তির আত্মপ্রকাশ এত ভয়াবহ হওয়ার কারণ যে অপপ্রয়োগ-এটা নিশ্চিত। কিন্তু এই অপপ্রয়োগের কারণ কি?

দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত পরমাণু নিয়ে গবেষণা যে পর্যায়ে পৌছেছিল তাতে এটা নিশ্চিত হওয়া গিয়েছিল যে তেজস্ক্রিয় মৌলের নিউক্লিয়াসেররূপান্তর ঘটালে কিছু পরিমাণ শক্তির মুক্তি ঘটে। এই শক্তিকে যদি গুণিতক আকারে বাড়ান যায় তবে তা যুদ্ধের মারণাস্ত্র রূপে ব্যবহার করা যাবে। যুদ্ধচলাকালীন সময় সাম্রাজ্যবাদীদের শক্তি প্রদর্শনের জন্য পরমাণুশক্তির বিপুলতা ও ভয়াবহতা জাহির করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পরেছিল। বিশ্ব বিখ্যাত বহু বিজ্ঞানী এ বিষয়ে সহমত ছিলেন। বিশ্বের নাম করা বিজ্ঞানীদের একটি অংশ তখন জার্মানিতে এবিষয়ে গবেষণা করছেন, জার্মান নাৎসি বাহিনীর অপ্রতিরোধ্য গতির সঙ্গে যদি পরমাণু বোমা যুক্ত হয় তবে বিশ্বের মানচিত্রের শুধু রাজনৈতিক চরিত্র নয় প্রাকৃতিক চরিত্রটাও বদলে যাবে – এই ধারণা তৎকালীন বিজ্ঞানীদের অনেকেরই ছিল, জার্মানির এই সম্ভাবনাকে প্রতিহত করতে আমেরিকায় গড়ে উঠল "ম্যান হাটন" প্রোজেক্ট যে প্রকল্পের উদ্দেশ্য যে পরমাণু বোমা তৈরী ও মানুষের ধ্বংসের জন্য তার ব্যবহার এটা অধিকাংশ বিজ্ঞানীরই অজানা ছিল। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৫ এ আমেরিকার নিউমেক্সিকোর লস্–অ্যালামসে তৈরী হল পরমাণু বোমা। কার্যত দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শেষ ঘোষণা হওয়ার অবস্থায় পৌছানোর পরে আমেরিকা-জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা বর্ষণ করে। এই বোমা বর্ষণের কারণ যেমন ছিল এই বোমার ক্ষতিকারক ক্ষমতার বাস্তব প্রত্যক্ষকরণ। কিন্তু তার চেয়েও বেশী প্রয়োজন ছিল সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব ব্যবস্থায় সমগ্র বিশ্বে মার্কিন শক্তির একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকার প্রতিষ্ঠার সূচনা করা।

পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন ও ব্যবহার না করার যুক্তি কি চেরনোবিল এবং ফুকুসিমা দাইচির - দুর্ঘটনা, হতে পারে?

যতদূর জানা যায় পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের (পুঁজিবাদে অধঃপতনের পর) চেরনোবিলের দুর্ঘটনা ঘটেছিল প্লান্টের সুপার কুলিং ব্যবস্থার ব্যবহার না করায়। জাপানে ২০১১ সালে পারমাণবিক চুল্লি সুনামির আঘাতে নষ্ট হয়ে

যায়। অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্রে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করার ফলে দুর্ঘটনা ঘটেছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে জাপান দেশটি পুরোপুরি কনভারজেন্ট প্লেট সীমান্তে অবস্থিত আইল্যান্ড আর্ক। এখানে নিয়মিত বড় ভূমিকম্প ও সুনামি হয়। এটা জানা সত্ত্বেও এখানে পরমাণু চুল্লি স্থাপন ছিল সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। সুতরাং দুটি ঘটনাকেই নিছক দুর্ঘটনা বলা যায় না।

দুর্ঘটনার জন্য কোন শিল্প বা উন্নয়ণমূলক কাজ বন্ধ হয় নি, হতে পারে না। সারা বিশ্বজুড়ে ট্রেন দুর্ঘটনা, বাস দুর্ঘটনা, খনি দুর্ঘটনা শিল্প কারখানায় দুর্ঘটনা কি কম ঘটেছে? দুর্ঘটনার জন্য এসব কিছু কি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে? যাদের বাড়ীর লোক যে দুর্ঘটনায় মারা গেছেন সেই বাড়ীর লোক সেই দুর্ঘটনার বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন? নাকি ত্যাগ করা সম্ভব? প্রেসারকুকার বার্স্ট করে নি? গ্যাস সিলিন্ডার বার্স্ট করে নি? মোবাইল ফোনের ব্যাটারি বার্স্ট করে নি? বিদ্যুৎ-পিষ্ট হয়ে লোক মারা যায় নি? নাকি আর কোন অ্যাক্সিডেন্ট ঘটবে না।

Accident বা দুর্ঘটনার আভিধানিক অর্থ –

1) An event that happens by chance.

2) An unpleasant & unexpected event.

কিন্তু ষড়যন্ত্রকে দুর্ঘটনা বলে ব্যাখ্যা করলে তা মেনে নেওয়া যায় না। ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা নয় – ভূপাল গণহত্যা। সঠিক নিরাপত্তার অভাবের জন্য হওয়া ঘটনাকে – দুর্ঘটনা বলা কতটা সমীচিন, ষড়যন্ত্র না ঘটলে এবং প্রকৃত নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকলে – দুর্ঘটনা যে নগণ্য হয়ে যাবে এটা অনেকেই জানেন।

শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী কী ?

সভ্যতার অগ্রগতিতে শক্তির তথা বিদ্যুৎশক্তির অবদান অপরিসীম। বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের গতি ও উৎপাদনশীলতা প্রতিস্থাপিত হয়েছে বিদ্যুৎচালিত ইঞ্জিন দ্বারা। বিদ্যুৎ – শিল্প-কারখানা, অফিস-কাছারি, স্কুল-কলেজ, আদালত থেকে গৃহস্থালী – সর্বত্রই নিত্য সঙ্গী। এর অপরিহার্যতা কতটা তা লোডশেডিং হলেই টের পাওয়া যায়। বিদ্যুৎই ২৪ ঘন্টার পূর্ণ দিবসকে ২৪ ঘন্টার কর্মদিবসে পরিণত করেছে। এই বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রকৃতির মধ্যে যে উৎসগুলি পাওয়া যায় তার কতগুলি পুনর্নবীকরণযোগ্য এবং কতগুলি তা নয়। পুনর্নবীকরণযোগ্য নয় এমন উৎসগুলির মধ্যে কয়লাই প্রধান। কিন্তু মানব সভ্যতার সময়সীমার নিরিখে এই কয়লার ভাণ্ডার একদিন শেষ হবে। পৃথিবীর সর্বত্র জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরীর সুযোগ নেই। ভারতের মত দেশগুলিতে – জলবিদ্যুতের যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও – ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা, হরকা বান-এর সম্ভাবনা প্রভৃতি বিচার না করে এবং রাজনৈতিক কারণে স্থাপিত জলবিদ্যুৎ নানা দুর্ঘটনার জন্ম দিয়েছে। অচিরাচরিত শক্তির উৎসগুলি (জোয়ার-ভাটা, বায়ুপ্রবাহ, সৌরশক্তি ইত্যাদি) থেকে অবিরাম একই গতি ও তীব্রতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব নয়। ফলে এর থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুৎ শক্তি শিল্প-কারখানায় ব্যবহার করা কতদূর বাস্তব সম্মত! তবে এই অজচিরাচরিত শক্তির উৎস থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুৎ শক্তিকে গৃহস্থালী, রাস্তা-ঘাটের বাতি ইত্যাদি বিভিন্ন পৌর কাজে ব্যবহার করা সম্ভব এবং উচিত।

সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য – বিজ্ঞানের সুফল সকলের কাছে পৌঁছে দিতে – শক্তির সকল উৎসকেই ব্যবহার করা উচিত। শক্তির উৎসগুলির মধ্যে পারমাণবিক শক্তিই একমাত্র ক্ষেত্র যেখানে ভর – শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। নিউক্লিয়াস বিভাজন পদ্ধতিতে কাঁচা মাল স্বরূপ ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা হয়। এই ইউরেনিয়াম-এর পরিমাণও মানব সভ্যতার অগ্রগতির নিরিখে সীমিত। নিউক্লিয়ার সংযোজন পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে শক্তি উৎপাদন করার গবেষণা চলছে। এই পদ্ধতির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের ভাণ্ডার হল সমুদ্রের ভারী জল। এই পদ্ধতি সফল হলে এটা জোর গলায় বলা যায় যে মানব সভ্যতার শক্তির সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হবে।

বর্তমান বিশ্ব যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে চলছে তা হল – বিশ্ব পুঁজিবাদ। এই ব্যবস্থায় উৎপাদনের প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্য হল – মুনাফা। মুনাফা বৃদ্ধি করতে উৎপাদন খরচ যতদূর সম্ভব কম করা। আর এই উৎপাদন খরচ কমানোর জায়গা হল শ্রমিকদের মজুরি হ্রাস করা, শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য খরচ না করা, বর্জ্য পদার্থ নিষ্ক্রমণের তথা পরিবেশগত দিক সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব খরচ কম করা। শুধুমাত্র পরমাণু শক্তি উৎপাদন ক্ষেত্র নয় – প্রতিটি শিল্প ক্ষেত্রেই একই চিত্র। বর্তমান সমাজে সব কিছুই পণ্য। তাই পরমাণু শক্তি ও তেজস্ক্রিয় আইসোটোপগুলির উপকারিতা পেতে হলে – তাদের বাজার থেকে আমাদের কিনতে হবে। সুতরাং **পরমাণু শক্তি ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারী এবং সমস্ত মানুষের নিরাপত্তার জন্য আবিষ্কৃত সকল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবিলম্বে চালু করা, এর সুফলগুলি সকলের কাছে পৌছানো এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার**

নিষিদ্ধ করা – এই দাবিগুলিই হল প্রগতিশীল দাবি। মুনাফার লক্ষ্যে উৎপাদনের জন্য, মালিকশ্রেণীর ত্রুটির জন্য, নিস্পৃহতার জন্য, তাদের ক্ষমতা দখলের যুদ্ধের জন্য যে বিষময় ফল আমরা দেখি তার জন্য বিজ্ঞানের এই আবিষ্কারকে মানবসমাজের কল্যাণে ব্যবহার হতে বাধা দান করা কি প্রগতিশীলতা? না, এটা প্রগতিশীল চেতনা নয়। প্রগতিশীল চেতনা তাকেই বলে যা মানব সমাজের বিকাশের পক্ষে, উন্নতির পক্ষে।

অনেকে বলেছেন পরমাণু শক্তির বিষয়ে পরীক্ষাগারে গবেষণা করা যেতে পারে – এর বেশি কিছু করা উচিত নয়। তাদের উদ্দেশ্যে বলা প্রয়োজন গবেষণার কাজে যে অর্থ প্রয়োজন হয় তা আসে ব্যবস্থার পরিচালকদের কাছ থেকে। তাঁরা অর্থকে পুঁজি রূপেই লগ্নি করে। তাই গবেষণা কোন্ স্বার্থে হবে সেটা তাঁরাই ঠিক করে – গবেষকরা নয়। এই গবেষণা ছোট্ট একটি ল্যাবরেটরির মধ্যে সম্ভব নয়। মানব সমাজে যে গবেষণার প্রয়োগ নাই তা সমাজে কাছে অর্থহীন। তাছাড়া শুধুমাত্র ল্যাবরেটরিতে গবেষণা করেই তো পরমাণু বোমা তৈরী হয়েছিল। জীবাণু বোমা তৈরী হচ্ছে। তবে কি জীবাণু যুদ্ধের জীবাণু সংরক্ষণের মতো – 'পরমাণু বোমা' সংরক্ষণ করার কাজকে আমরা সমর্থন করব?

পরমাণু বোমার ব্যাপক ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করার পরও কোনও রাষ্ট্রই যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরমাণু শক্তি ব্যবহার নিষিদ্ধ করে নি। বরঞ্চ প্রতিটি দেশের সামরিক মর্যাদা, অহঙ্কার ও হুমকি দেওয়ার শক্তি হয়েছে পরমাণু-শক্তি। বিশ্ব তথা প্রতিটি রাষ্ট্রই শ্রেণী বিভক্ত। পুঁজিপতি শ্রেণী সারা বিশ্বে তাদের উৎপাদন ব্যবস্থা কায়েম রেখেছে। এই ব্যবস্থাটা জনকল্যাণমুখী নয়। এই ব্যবস্থায়, 'অর্থ' রূপ ধারণ করেছে 'পুঁজি'র। 'সেবা' প্রতিস্থাপিত 'পরিষেবা' দ্বারা, প্রয়োজন প্রতিস্থাপিত হয়েছে 'চাহিদা' দ্বারা।

আজ আমাদের দেশের অধিকাংশ গ্রামে সকলের কাছে বিদ্যুৎ পৌছায় নি, সকলের প্রয়োজনীয় শিল্প উৎপাদন পেতে উৎপাদনের বিপুল বিকাশ প্রয়োজন। আমরা চোখ খোলা রাখলেই দেখতে পাই – সকলের প্রয়োজন মেটে নি, কিন্তু শিল্প ক্ষেত্রগুলি অতি উৎপাদনের সঙ্কটে ভুগছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন ও পণ্য সরবরাহ হয় 'চাহিদা ও যোগানের' নিয়মে। এই ব্যবস্থায় প্রয়োজন ও চাহিদা এক বিষয় নয়। যাদের পণ্য ক্রয় করে প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতা আছে তাদের প্রয়োজনটাই হল চাহিদা। আর যাদের ক্রয়ক্ষমতা নাই তাদের প্রয়োজনটা চাহিদা নয়।

তাহলে পরমাণু শক্তির উৎপাদন ও তার জনকল্যানমুখী ফল পাওয়ার সমস্যাটা কোথায়? সমস্যাটা কি পরমাণু শক্তি? সমস্যাটা কি বৈজ্ঞানিক গবেষণার? সমস্যাটা কি তার ব্যবহার? নাকি সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণে এর সুফল না পৌছানো? বৈজ্ঞানিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মানুষের ধ্বংসে একে কাজে লাগানোর জন্য পুঁজির মালিকশ্রেণী এবং তার ব্যবস্থা দায়ী। যে গাছে বিষফল জন্মায়, তার বিষফল তুলে নিলে বিষ উৎপাদন বন্ধ হয় না, বিষফলদায়ী গাছটা উপড়ে ফেলাটাই বিষের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া একমাত্র উপায়। পরমাণু শক্তিসহ পৃথিবীর সকল সম্পদ প্রকৃত অর্থে মানব কল্যাণে ব্যবহার করতে হলে এই ব্যবস্থা অবসানের লক্ষ্যে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে – ক্ষতির সম্ভাবনা দেখে মানব প্রগতির বিরুদ্ধে যাওয়া বিজ্ঞান মনস্কতা নয়। ■

শোক সংবাদ

আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডঃ শুভাশিস মাইতি ২০১৩ সালের শেষার্ধে প্রয়াত হয়েছেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মৌলিক অবদানের পাশাপাশি তিনি সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞান সচেতন করার ক্ষেত্রে ধারাবাহিক ভূমিকা রেখেছেন এবং বাংলা ভাষায় বহু জনবোধ্য রচনা লিখেছেন। তাঁর অকস্মাৎ প্রয়াণ বিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মীদের যেমন শোকস্তব্ধ করেছে অন্যদিকে তাঁর অসমাপ্ত কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করছে।

গত ডিসেম্বর মাসে কণা পদার্থ বিজ্ঞানী ডঃ অভী দত্ত মজুমদার দূরারোগ্য ক্যান্সারে মাত্র ৪৫ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন। এই স্বল্পকালে বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন তেমনই নানা সামাজিক আন্দোলনেও তিনি ছিলেন সক্রিয়।

জিজ্ঞাসা এবং তার সমাধান

[প্রাচীনকাল থেকেই চিন্তাশীল মানুষ অজানাকে জানার প্রয়াস চালিয়ে এসেছে। চারপাশের জগৎ তথা প্রকৃতি এবং সেই জগতে ঘটে চলা নানা ঘটনার কারণ, মানবসমাজ, মানুষে মানুষে সম্পর্ক, নিজেকে নিয়ে, নিজের শরীর ও মন নিয়ে নানা জিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজার কোন বিরাম নেই। মানব সমাজ, তথা মানুষের সৃষ্টি, এই পৃথিবীর সৃষ্টি, এই সৌরমন্ডল এমনকি বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের সৃষ্টির প্রয়াস চলেছে লাগাতার। প্রথমতঃ পূর্ব অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে যুক্তির বিকাশ হয়। প্রচলিত কাল্পনিক মতকে খন্ডন করতে জন্ম হয় যুক্তিবাদের। এর পাশাপাশি শুরু হয় সমগ্র পরিমন্ডলের মধ্যে কোন বস্তুকে জানার প্রয়াস। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বস্তুর জন্ম ও বিকাশের নিয়ম আবিস্কারের মধ্য দিয়ে জন্ম হয় বিজ্ঞানের। অজ্ঞেয়কে জানার প্রয়াসের মধ্যে প্রতিকূলতাকে জয় করার মধ্যেই মানবপ্রগতির সমস্ত শর্ত লুকিয়ে আছে। বিজ্ঞানের আলোয় আসুন আমরা মনের কোণে লুকিয়ে থাকা নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজি। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলির ভিত্তিতে এই সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রতি সংখ্যায় আমরা নানা 'জিজ্ঞাসা এবং তার সমাধান' খুঁজব। –সম্পাদকমন্ডলী, সমীক্ষণ]

ঘুমের মধ্যে আমরা স্বপ্ন দেখি কেন ?

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা ইঁদুরের শরীরে পরীক্ষা করে জেনেছেন যে প্রাণীরা তাদের মস্তিষ্ককে পরিস্কার করে স্বকীয়ভাবে নিউরণ বা নার্ভ কোষগুলির মধ্যকার চ্যানেলগুলি বা পথের প্রসারণ ঘটিয়ে। এই প্রসারণের ফলে মস্তিষ্কের তরল বা সেরিব্রাল ফ্লুইড অধিক পরিমাণে প্রবাহিত হয়। আর এই ঘটনা ঘটে ঘুমের সময়। পরীক্ষা দ্বারা বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে মানব মস্তিষ্কের বিভিন্ন কোষ ও কলাগুলিকে সক্রিয় রাখা এবং মেরামতির জন্য ঘুম অপরিহার্য।

এখন প্রশ্ন হল, এই ঘুমের মধ্যে আমরা স্বপ্ন দেখি কেন? এই প্রশ্নে অধিবিদ্যক তথা ভাববাদীরা নানা মত প্রচার করে থাকেন। বলা হয় ঘুমের সময় শরীর নয় মন ক্রিয়া করে, এটা বস্তুজগতের থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র। বলা হয় ঘুমের সময় শরীরের মধ্যকার আত্মা ইহজগৎ এবং পরজগতের মধ্যে বিচরণ করে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সাথে তার সম্পর্ক হয় যদি তিনি ধর্মের পথে চলেন। ধর্মাচারী মানুষকে ঘুমের মধ্যে ঈশ্বর যে আদেশ দেন বা পথ দেখান তাই স্বপ্ন। তাই ভোরের স্বপ্নাদেশ সত্য হয় যদি মনপ্রাণ দিয়ে তাঁকে ডাকা যায়। আর অধর্মাচারী তথা পাপী মানুষকে ঈশ্বর স্বপ্নে ভয় দেখান ইত্যাদি। অর্থাৎ ভাববাদীরা স্বপ্ন যে মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ফল তা মেনে নেন না।

কিন্তু দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় আমরা বুঝতে পারি যে যতক্ষণ মানুষ ঘুমায় ততক্ষণ সে স্বপ্ন দেখে না। স্বপ্নে যে ঘটনাপরস্পরার সে দেখে তা অতি অসংলগ্ন, কখনও কখনও কিম্ভুত কিমাকার কখনও ভয়ঙ্কর হলেও তা সবই বস্তুজগৎ সম্পর্কিত। প্রিয়জনের ভালমন্দ নিয়ে যে মানুষ চিন্তায় থাকে স্বপ্নে সেইজনের কখনও ভাল আবার কখনও মন্দ দেখে। আকাঙ্খিত বস্তু কখনও মিলে যায় আবার কখনও মিলতে মিলতে হারিয়ে যায়। স্বপ্নে অতীত ও বর্তমান সব মিলে মিশে যায়। সমাজবিজ্ঞানীরা মনকে বস্তুজগতের বাইরের কিছু মনে করেন না। তাঁদের মতে মন হল বস্তুজগতের মানব মস্তিষ্কে প্রতিফলন। আলাদা কিছু নয়। চোখে দেখা দৃশ্যাবলী ও চরিত্রগুলি নিয়ে নানা ভাবনাই আমরা স্বপ্নে দেখি।

বিজ্ঞানীরা বলেন যে আমাদের ঘুমের মধ্যে প্রধানতঃ দুটি ভাগ আছে– (১)REM (Rapid eye movement) sleep এবং (২) Non REM Sleep. ঘুমের মধ্যে একটা সময় আমাদের

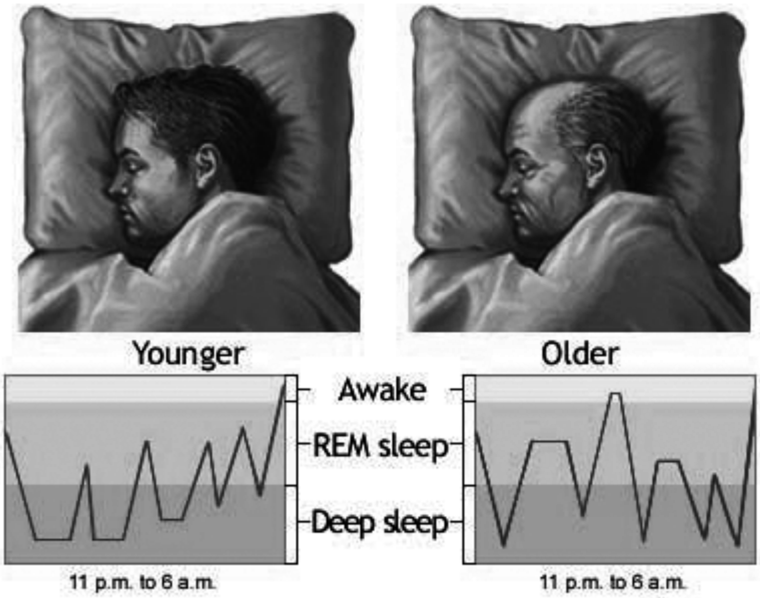

চোখের মণি স্থির থাকে না, প্রবলবেগে অক্ষিগোলক ঘুরতে থাকে (rapid eye movement)। ঘুমের এই অংশকে আমরা বলি REM Sleep. ঘুমের মধ্যে বাকী সময় আমাদের চোখের মণি স্থির থাকে। এই সয়মকার ঘুমকে Non REM Sleep বলা হয়। এই REM Sleep কে বিজ্ঞানীরা paradoxial Sleep বা প্রচলিত মতবিরুদ্ধ অথচ সত্য এমন ঘুম হিসাবে বর্ণনা করেছেন। বিজ্ঞানীরা এই REM Sleep কে প্রচলিত মতবিরুদ্ধ বা paradoxial এই কারণে বলেছেন যে, যদিও আমরা ঘুমাচ্ছি অথচ আমাদের মস্তিষ্কের বিপাক ক্রিয়া প্রায় জেগে থাকা অবস্থার মত আছে এবং চোখদুটি ঘুরছে এমনভাবে যেন সে মস্তিষ্ক থেকে উত্তেজনা বহণ করে চলেছে। আমাদের ঘুমের মধ্যে এই REM Sleep পর্যায়ে মস্তিষ্ক থেকে চোখ যে উত্তেজনা বা সংবেদন গ্রহণ করে **সেই সংবেদন (sense) টাই হল আসলে স্বপ্ন**। ঘুমের মধ্যে বাকী পর্যায়ে মস্তিষ্কের বিপাক ক্রিয়ার হার প্রচন্ড কমে যায়। ঘুমের মধ্যে বাকী সময় অর্থাৎ Non REM Sleep এর সময় আমরা স্বপ্ন দেখি না। আমাদের মস্তিষ্ক তখন সেই কাজ না করায়।

বিজ্ঞানীরা বলেন স্বপ্ন দেখা মানুষের শারীরবৃত্তিয় কাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। স্বপ্নের মধ্যে আমাদের সামনে এমন সব অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায় যা দৈনন্দিন জীবনে সরাসরি প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা আমাদের নেই। তাই REM Sleep বা ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখা হল আসলে একটা শিক্ষাগ্রহণের প্রক্রিয়া যেখানে মস্তিষ্ক তা অনুশীলন করে। এই কারণে স্বপ্নগুলির অধিকাংশই হল এমনই কিম্ভুত কিমাকার ঘটনাপরস্পরায় যা বাস্তবজীবনে এমনভাবে আসে না। [চিত্র ৫]

এখন প্রশ্ন হল **অধিকাংশ স্বপ্ন আমরা মনে রাখতে পারি না কেন? আর কিছু কিছু স্বপ্ন বহুদিন মনে থেকে যায় কেন?**

বিজ্ঞানীরা বলেন যে মানুষ যে সব স্বপ্ন দেখে তার অধিকাংশই মস্তিষ্কে সঞ্চিত হয় শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা হিসাবে যা সে অন্যকে বলতে পারে না বা মনেও রাখতে পারে না। অধিকাংশ স্বপ্নই যেহেতু অদ্ভুত এবং ভয়ঙ্কর হয় তাই এগুলি মনে না থাকায় স্বপ্ন দেখা ব্যক্তির উপকারই হয়। এটা হয় কেন? কারণ REM Sleep পর্যায়ের পর Non Sleep এর একটা পর্যায় আসে যাকে বিজ্ঞানীরা বিশেষিত করেছেনSlow Wave Sleep (SWS) বলে। এই পর্যায় ঘুমের সময় মস্তিষ্কে সঞ্চিত স্বপ্নগুলি ধুয়ে মুছে যায় এবং স্বপ্ন দেখা মানুষ ঘুম থেকে ওঠার পর আর কিছুই মনে রাখতে পারেন না।

কিন্তু অনেক স্বপ্ন আমাদের মনে থেকে যায়। প্রধানভাবে এটা লক্ষ্য করা গেছে যে স্বপ্ন দেখাকালীন কোন মানুষ ভয়ে অথবা পরিবেশের প্রভাবে হঠাৎ জেগে উঠলে বা তাকে জোর করে জাগিয়ে দিলে দেখা স্বপ্নগুলি তার মনে থেকে যায় বেশ কিছু সময়ের জন্য। ইউরোপে রেনেঁসা-র সময় বহু বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের ঘুমের মধ্যে স্বপ্নদেখাকালীন (REM Sleep) জোর করে জাগিয়ে দিয়ে তাদের সেইসব স্বপ্নগুলিকে চিত্রিত করতে বলা হত। ওইসব চিত্রশিল্পীদের পয়সা দিয়ে যারা ছবি আঁকাত তারা এইভাবে শিল্পীদের কাজ করাত। ওই সময়কালে সৃষ্ট এইসব ছবিগুলি হল ওই শিল্পীদের স্বপ্নের প্রতিফলন।

সাধারণভাবে বলা যায় যে ঘুমের মধ্যে দেখা স্বপ্ন (REM Sleep) যদি পরবর্তী Slow Wave Sleep পর্যায়ে সমগ্রটা মুছে যাওয়ার সুযোগ না পায় তবে আমরা স্বপ্নে দেখা একটা অংশ অথবা পুরোটাই মনে করতে পারি। কিন্তু মস্তিষ্কের ক্রিয়া এমনভাবেই চলে যাতে ঘুমের শেষে আমরা আর তাকে

মনে রাখতে না পারি। **তাই স্বপ্ন মনে রাখতে না পারাটাই শারীরিক প্রক্রিয়ার নিয়ম আর বিশেষ পরিস্থিতিতে স্বপ্ন দেখাকালীন আচমকা ঘুম ভেঙে গেলে আমরা সেই স্বপ্ন অল্প সময় মনে রাখতে পারি। আর সেই স্বপ্ন নিয়ে জেগে থাকা অবস্থায় চর্চা করলে বেশী সময় মনে রাখতে পারি।**

বিজ্ঞানীরা বলেন যে মানুষের মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বয়সের সাথে সাথে যত কমে যায় ততই সে কম স্বপ্ন দেখে। সবল ও ক্রিয়াশীল মস্তিষ্ক সম্পন্ন অল্পবয়সীরা তুলনায় বেশী স্বপ্ন দেখেন। সদ্যজাত শিশুও তাঁর মস্তিষ্ক এবং বর্হিজগৎ সম্পর্কে তার ধারণা অনুসারে স্বপ্ন দেখে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ডেভিড ফাউলকসের মতে যদিও ছোটখাট ছবি দেখার ক্ষমতা শিশুদের থাকে, কিন্তু তাকে একটা গল্পের সুতোয় তারা বাঁধতে পারে না।REM sleep এর সয়ম ঘুম থেকে জোর করে তুলে দিয়েও দেখা গেছে যে ২০% শিশু কিছুটা স্বপ্ন বর্ণনা করতে সক্ষম হয়। আর পূর্ণবয়স্ক মানুষদের জোর করে ঘুম থেকে তুলে দিলে ৮০-৯০% মানুষ স্বপ্নের নিখুঁত বর্ণনা করতে পারে। শিশুদের স্বপ্নে কোন চরিত্র নড়াচড়া করে না, অনুভূতি থাকে না। সদ্যজাত শিশুর ঘুমের মধ্যে হাসি বা কান্নাকে অনেকে পূর্বজন্মের স্মৃতি বা স্বপ্নের অনুভূতি বললেও সেগুলি পূর্ণবয়স্ক মানুষের স্বপ্নের মধ্যে হাত-পা ছোঁড়া বা কথা বলার ঘটনার চেয়ে আলাদা। শিশুদের স্বপ্নে সে নিজে উপস্থিত থাকে না অথচ বড়দের স্বপ্নে সে নিজে উপস্থিত থাকবেই। **জন্মান্ধ মানুষ যেহেতু চোখে দেখে না, তার দৃশ্যানুভূতি নাই তাই সে স্বপ্নও দেখে না।** এই ঘটনা বস্তু থেকে চিন্তা বা চেতনার উৎপত্তির বস্তুবাদী দর্শনকে প্রমাণ করে। কিন্তু যাঁরা শৈশবে বা পরে অন্ধ হয়েছেন তাঁরা তাঁদের একসময় দেখা দৃশ্যের ভিত্তিতে স্বপ্ন দেখেন। আর একদম শৈশবে, প্যারাটাইল লোব গঠন হওয়ার আগে যাঁরা অন্ধ হয়েছেন তাঁরা স্বপ্নে দৃশ্য দেখেন না আলো দেখেন। মস্তিষ্কে স্মৃতি সঞ্চয় শুরু হওয়ার আগে মানুষের পক্ষে স্বপ্ন দেখা অসম্ভব বলে মনে করেন বিজ্ঞানীরা। তাই হিন্দু পুরাণে অজাত শিশুদের বেদগান শুনে তা মনে রাখার যে গল্প প্রচলিত আছে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে তা সত্য নয় কল্পনামাত্র।

বিজ্ঞানীরা বলেন যে ঘুমের সময় সাধারণ অবস্থায় আমাদের skeletal muscle গুলি অসাড় বা paralysed হয়ে থাকে বলে স্বপ্নের সংবেদন অনুসারে আমরা আমাদের দেহ নড়াচড়া করা, কথা বলা ইত্যাদি (enact) করতে পারি না। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন যে কিছু মানুষের মধ্যে একধরণের অস্বাভাবিকতা বা disorder দেখা যায়। একে স্বপ্নদেখাকালীন অস্বাভাবিকতা বা REM Sleep behaviour disorder বলে। এই অস্বাভাবিকতা যাঁদের মধ্যে দেখা যায় তাঁরা ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে যা দেখেন তা কথায় বা হাত-পা নেড়ে অভিনয় করার চেষ্টা করেন। তখন তাঁকে নানা গোঙানি করতে এবং অস্বাভাবিক হাত-পা ছুঁড়তে দেখা যায়। অসুস্থ রোগীর ক্ষেত্রে এই অস্বাভাবিকতা বিপদ সৃষ্টি করতে পারে। বিছানায় পাশে শোয়া মানুষটিরও ঘুমের ব্যাঘাত হতে পারে। স্বপ্ন দেখার সময় আমরা যা দেখি তা অসংলগ্ন ও সম্পর্কহীন হলেও স্পষ্ট হয়। স্বপ্ন দেখার সময় সাধারণত আমরা অন্যের কথা বা আওয়াজ শুনতে পাই না এবং গন্ধ অনুভব করি না। এটা এই কারণে যে স্বপ্ন দেখার সময় মস্তিষ্কের দৃশ্যকেন্দ্রে (visual centre) রক্তসংবহণ অন্যত্র থেকে বহুগুণ বেড়ে যায়। মস্তিষ্কের অন্য অঙ্গগুলিতে রক্তসংবহণ কমে যাওয়ায় অন্য ইন্দ্রিয়গুলি– শ্রবণ, ঘ্রাণ ইত্যাদির ক্রিয়া কমে যায় বা বন্ধ হয়ে যায়।

স্বপ্নকাল হল এমন একটা সময় যখন চিন্তন প্রক্রিয়া thought process এবং বিভিন্ন সম্ভাবনাকে খোঁজার এবং তারমধ্যে কোনকিছুকে বেছে নেওয়ার (exploring various possibilities) কাজ করে আমাদের মস্তিষ্ক। সবশেষে আবারও বলা দরকার যে স্বপ্ন মানুষের মস্তিষ্কের বিকাশে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং যে মানুষ স্বপ্ন দেখে না, তাঁর মধ্যে অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। উল্টোদিকে রেম স্লিপ-এ যেহেতু মস্তিষ্কের বিপাক ক্রিয়ার হার জেগে থাকা অবস্থার মতই থাকে তাই সে সময় মস্তিষ্ক প্রকৃতপক্ষে বিশ্রাম পায় না। তাই অত্যধিক রেম স্লিপ ক্লান্তিকর। স্বপ্ন বস্তুবিচ্ছিন্ন কোন ভাবজগতের ক্রিয়া নয়, চারপাশের বস্তুজগৎ নিয়ে মস্তিষ্কের বিপাক ক্রিয়ার ফল। স্বপ্ন যেহেতু মস্তিষ্কের একটি শিক্ষাগ্রহণ প্রক্রিয়া তাই যে মানুষ স্বপ্ন দেখে না সে সৃষ্টিশীল হয় না।

[সূত্র ঃ * ১৯/১২/২০১৩ এবং ৬/২/২০১৪ তারিখে 'দ্য হিন্দু' পত্রিকার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি পাতার কোয়েশ্চেন কর্নার কলামে পাঠকদের প্রশ্নের জবাবে অল ইণ্ডিয়া ইনস্‌টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সের চিকিৎসক কার্ত্তিক গুপ্তের রচনা।

*বসু বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষক সোনালী গুপ্তের 'এই সময়' পত্রিকায় (৩রা মার্চ ২০১৪) প্রকাশিত রচনা।

*৩০/১২/২০১৩ 'দ্য হিন্দু' পত্রিকায় বিজ্ঞান পত্রিকাগুলির মতে ২০১৩ সালের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার শীর্ষক সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি পাতার রচনা।]

সাপের মত বিষাক্ত প্রাণীরা নিজেদের বিষে আক্রান্ত হয় না কেন ?

সাপের বিষ বা venoms এক প্রকার প্রোটিন যা বহু অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং আরও নানা সমধর্মী রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা গঠিত। সব সাপ বিষধর নয়, এই বিষেরও প্রকারভেদ আছে, বিষক্রিয়ার ফলাফলও হয় নানা রকম। কিন্তু বিষধর সাপকে নিজের বিষ দ্বারা আক্রান্ত হতে দেখা যায় না কেন?

বিজ্ঞানীরা বলেন যে সাপের বিষ আক্রান্ত প্রাণীর পেশী কোষের উপরে থাকা রিসেপটরগুলির সাথে বন্ধনযুক্ত (binding) হয়ে আক্রান্ত জীবের নার্ভ কোষ এবং পেশী কোষের মধ্যকার যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়।

যখন কোন রিসেপটর toxin বা বিষ দ্বারা সংযুক্ত হয়ে যায় তখন স্বাভাবিক নিউরোট্রান্সমিটার অ্যাসিটাইকোলিন আর সেই রিসেপটরের সাথে সংযুক্ত হতে পারে না, ওই রিসেপটরগুলি বিষের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যাওয়ার কারণে। এর ফলে মস্তিষ্ক থেকে রিসেপ্টরগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং দেহ ধীরে ধীরে অসাড় বা paralysed হয়ে যায়, শেষ পরিণতিতে প্রাণীটির মৃত্যুও ঘটতে পারে। ইঁদুর থেকে মানুষ – প্রতিটি প্রাণীর ক্ষেত্রেই এই রিসেপ্টরগুলি পৃথক হওয়ায় একই সাপের বিষ দ্বারা বিভিন্ন প্রাণীর আক্রান্ত হওয়ার প্রকৃতিও পৃথক।

সাপের দেহের শর্করা (Sugar) অনুগুলি তার দেহের রিসেপ্টরের প্রোটিনের প্রাথমিক উপাদান অ্যামাইনো অ্যাসিড ও তার উপজাতগুলিকে (derivatives) মেঘের কণার মত ঘিরে থাকে যাতে বিষ রিসেপ্টরের সাথে সংযুক্ত হতে পারে না। যদিও মানুষ, সাপসহ প্রাণীজগতের প্রত্যেকের রিসেপ্টরের অ্যামাইনো অ্যাসিড ও তার উপজাতগুলি একই রাসায়নিক দিয়ে তৈরী তবুও রিসেপ্টরগুলিকে দেহের শর্করা অণু মেঘের মত ঘিরে থাকার কারণে সাপের মত বিষধর প্রাণীরা নিজস্ব বিষ দ্বারা আক্রান্ত হয় না।

গবেষকরা প্রমাণ পেয়েছেন যে মাত্র দুটি প্রজাতির প্রাণী– **সাপ এবং বেজির** দেহে পেশীর রিসেপ্টরগুলিতেই এইভাবে শর্করা অণু মেঘের মত ঘেরা থাকে। আমরা জানি যে বিভিন্ন ধরণের বিষ আক্রান্তের দেহের বিভিন্ন ধরণের কোষকে বিভিন্নভাবে আক্রমণ করে। কিন্তু প্রতিটি প্রজাতির সাপই অন্য সব প্রজাতির সাপের বিষ থেকে এই একই পদ্ধতিতে অব্যহতি পায়। এছাড়া প্রতিটি সাপই তার নিজস্ব প্রজাতি species এর বিষের আক্রমণ প্রতিহত করে জৈবিক ক্রিয়ার সময়। যেমন একটি প্রজাতির বিষধর পুরুষ ও স্ত্রী সাপ যৌন মিলনের সময় একে অপরকে উত্তেজিত করতে বা সঙ্গমে বাধাদান করতে একে অপরকে বিষের কামড় দেয়। এই প্রক্রিয়ায় একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির বিষধর সাপ সেই প্রজাতির সকলকেই নিজস্ব বিষের আক্রমণ থেকে immune করে তোলে।

বিষধর সাপেরা অন্য যে যে প্রক্রিয়ায় নিজেদের বিষের আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচায় তা হল – বিষাক্ত সাপের শরীরে যে বিষথলি বা venom gland আছে তাতে এক বিশেষ ধরণের পর্দা থাকে। এই পর্দা থাকার ফলেই বিষথলির বিষ রক্তে মিশতে পারে না।

এটা আমরা সকলেই জানি যে বিষ যতক্ষণ না রক্তপ্রবাহে মেশে ততক্ষণ প্রাণীরা বিষের আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে সাপের বিষ একপ্রকার প্রোটিন যৌগ যা পান করলে সেটা যদি খাদ্যনালী দিয়ে যাওয়ার সময় কোন ক্ষতের (আলসার) সম্মুখীন না হয় তবে সেই বিষপানে কারও ক্ষতি হয় না। মুখ, গলা, খাদ্যনালী ও পাকস্থলীতে যে ব্যক্তির কোন ক্ষত নেই সেই ব্যক্তি বিষপান করেও বিষের দ্বারা আক্রান্ত হন না।

বেজির শরীরে যেহেতু সাপের মত বিষ প্রতিষেধক ব্যবস্থাপনা আছে তাই বিষধর সাপের কামড়ে কখনও বেজির মৃত্যু হয় না। উল্টে উন্নত প্রাণী হওয়ায় বেজি সাপকে ক্ষতবিক্ষত করে মেরে দেয়, এমনকি খেয়েও নেয়। তান্ত্রিক, ভন্ড সাধু ও সাপুরেরা সাপ ও বেজির যে গল্প প্রচার ক'রে পয়সা কামায় – বিষাক্ত সাপের কামড়ে আক্রান্ত বেজি বিষের প্রতিষেধক ভেষজ (গাছের শিকড়) দিয়ে নিজেকে সাপের আক্রমণ থেকে বাঁচায়– তা সর্বৈব মিথ্যা। এটা প্রচার ক'রে কিছু সাপুরে ও সাধুরা সাপের বিষের প্রতিষেধক মূল বা শিখর বিক্রি করে লোক ঠকায়। আমাদের মনে রাখা দরকার যে সাপের বিষ প্রতিষেধক কোন ভেষজ বা রাসায়নিক এখনও পর্যন্ত আবিস্কার হয় নি। একমাত্র বিষাক্ত সাপের বিষ থেকেই তৈরী অ্যান্টিভেনম (antivenom) চিকিৎসাই পারে সাপের বিষের আক্রমণ থেকে মানুষকে রক্ষা করতে অন্য কোন উপায়ে নয়। ■

[সূত্র ঃ *দ্য হিন্দু পত্রিকায় ২৬/১২/২০১৩, সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি পাতার কোয়েশেন কর্ণারে তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরের ভারথিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনলজি বিভাগের অধ্যাপক আজওয়ার রঘুনাথ রচিত রচনা।*]

পাঠকের মতামত

মনুষ্যজনিত কারণেই বিশ্ব উষ্ণায়ণ

মুখ্য প্রশ্ন হল বিশ্ব কি উষ্ণ হচ্ছে? এবং তা যদি হয় তবে এর জন্য মানুষের কার্যকলাপ কি গুরুতর ভূমিকা পালন করছে? ব্যক্তি হিসাবে এই প্রশ্নের সত্যতা আমরা কিভাবে বিচার করব? আমরা অবশ্যই এই প্রসঙ্গে যে বিশাল পরিমাণ তথ্য আমাদের সামনে হাজির আছে তা ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারব না। এই প্রসঙ্গে যা তথ্য আছে তা বিশাল। ব্যক্তি হিসাবে আমাদের সেই প্রশিক্ষণও নেই যার সাহায্যে আমরা তথ্যগুলিতে ঠিকভাবে বিশ্লেষণ, মূল্যায়ণ করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি, আর এর জন্য যথেষ্ট সময়ও আমাদের নেই। তবে আমরা কি এই প্রসঙ্গে দৃঢ় মতামত গঠন করতে পারি না?

এর উত্তরটা সহজ। যখন কোন কোর্ট বা বিচারব্যবস্থা কোন মতামত গঠন করতে চায় (যে বিষয়ে তার জ্ঞানের ঘাটতি আছে) তখন সে, সে বিষয় বিশেষজ্ঞদের মতামত ও যুক্তি শুনে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক বিচার করে, প্রমাণগুলির ওজন বিচার করে মতামত গঠন করে। ব্যক্তি হিসাবে আমরা এভাবেই মতামত গঠন করতে পারি।

এই প্রশ্নগুলির সমাধানে আমরাই প্রথম পদক্ষেপ রাখছি না। এই প্রশ্নটা বিচার করতে হলে প্রথমে যা বিচার করা উচিৎ তা হল ঃ

“পরিবেশের পরিবর্তন সম্বন্ধে যে বৈজ্ঞানিক মতামত তা হল – পৃথিবীর জলবায়ু ব্যবস্থা অনস্বীকার্যভাবে উষ্ণ হচ্ছে, এবং এটার প্রধান কারণ (অন্ততঃ ৯৫ শতাংশ নিশ্চিতভাবে বলা যায়) মানুষের নানা কার্যকলাপ যা বায়ুমন্ডলে গ্রীণহাউস গ্যাসগুলির মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে বনাঞ্চল কেটে, ফসিল ফুয়েল জ্বালিয়ে ... এই বৈজ্ঞানিক সহমহ প্রতিফলিত হয়েছে বিভিন্ন বিশ্লেষণমূলক রিপোর্টে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীদের সংস্থা (Scientific body) দ্বারা এবং পরিবেশ বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ দ্বারা। ব্যক্তিগতভাবে বিজ্ঞানীরা, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এবং ল্যাবরেটরীগুলি এই বৈজ্ঞানিক মতামত গঠনে ভূমিকা রেখেছে।

“জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান অ্যাকাডেমিগুলি জলবায়ুর পরিবর্তন প্রশ্নে সাম্প্রতিক মতামত যাচাই করেছে। এই অ্যাসেসমেন্টগুলি ইন্টারগর্ভমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্চ (আই পি সি সি)-র মতামতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এগুলিকে সারসংক্ষেপ করলে দাঁড়ায় ঃ জলবায়ু ব্যবস্থা অবশ্যম্ভাবীভাবে উষ্ণ হচ্ছে, যার প্রমাণ হল – বায়ুমন্ডল ও সমুদ্রের তাপমাত্রাবৃদ্ধি, তুষার এবং বরফের গলনবৃদ্ধি এবং সমুদ্রের জলতলের বৃদ্ধি। এই উষ্ণতাবৃদ্ধির জন্য মনুষ্যজনিত কার্যকলাপই প্রধানভাবে দায়ী। (উইকিপিডিয়া)”

২০০১ সালের ১৮ই মে ১৭টি দেশের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি – অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, ব্রাজিল, কানাডা, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, চীন, ফ্রান্স, জার্মানি, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, আয়ারল্যান্ড, ইতালি, মালয়েশিয়া, নিউজিল্যান্ড, সুইডেন, তুরস্ক এবং সংযুক্ত রাজ্য (ইউ কে) জার্নাল সায়েন্স পত্রিকায় আইপিসিসি-র মতামতের পক্ষে সাক্ষর প্রদান করে। ২০০৫ সালে জি৮ ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির জাতীয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি এবং রাশিয়া ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি এই মতামতের পক্ষে মতদান করে। ২০০৭ সালে জাপান, মেক্সিকো, দঃ আফ্রিকার জাতীয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি একই মত পোষণ করে। ২০০৭ সালে জি৮ শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতিতে নেটওয়ার্ক অফ আফ্রিকান সায়েন্স অ্যাকাডেমি একটি যৌথ বিবৃতিদান করে সাসটেইনেবিলিটি, এর্নাজি এফিসিয়েন্সি এবং ক্লাইমেট চেইঞ্চ প্রসঙ্গে। এতে বলা হয় জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য ফসিল ফুয়েলের জ্বলনই প্রধান কারণ। এই যৌথ বিবৃতি দেয় ১৩টি দেশের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমিগুলি যেমন ক্যামেরুন, ঘানা, কেনিয়া, মাদাগাস্কার, নাইজেরিয়া, সেনেগাল, দঃ আফ্রিকা, সুদান, তানজানিয়া, জাম্বিয়া, জিম্বাবোয়ে এবং আফ্রিকান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স।

২০০৭ সালে অ্যামেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অফ

●শেষাংশ ২৭ পৃষ্ঠায়

মতামত

সমকামিতা কি বিজ্ঞান সম্মত?

[গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ-র বার্ষিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বক্তারা যে বিতর্কমূলক আলোচনা করেছেন, পাঠকদের অবগতির জন্য তার সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরা হল "তর্কের জন্য বিতর্ক নয়; সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি উঠে আসুক।" এরকম ভাবনা থেকেই "বিজ্ঞান মনস্ক" বিতর্কমূলক আলোচনা অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছিলো। বিষয় রেখেছিলো – "সমকামিতা কি বিজ্ঞান সম্মত?" বক্তা ছিলেন - মোট ৪ জন, বিভিন্ন সংগঠন থেকে এবং ব্যক্তিগতভাবে। উপস্থিত সকল শ্রোতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন – কতটা সঠিক, বিজ্ঞাসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছিলো অনুষ্ঠানটিতে। যারা উপস্থিত থাকতে পারেননি তাদেরকেও বিষয়টি স্পর্শ করে যাক - এই অভিপ্রায় আমাদের। তাই চার জন বক্তার বক্তব্য সংক্ষিপ্তাকারে এখানে দেওয়া হল- সম্পাদকমন্ডলী, সমীক্ষণ]।

বাললিত হালদার ঃ সমকামিতা – যেটাকে আমরা হোমোসেক্সুয়ালিটি বলি। এটা দু'ধরনের হয়। পুরুষ-পুরুষের প্রতি, নারী নারীর প্রতি যৌন আকর্ষণ অনুভব করে। এটা বিজ্ঞান সম্মত কিনা সেটা এখনও পর্যন্ত জিনগত দিক থেকে জীব বিজ্ঞানীরা সুনির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি। কেউ কেউ দাবি করছেন, যারা সমকামী তাদের দেহে ক্রোমোজোমের সংখ্যা বেশি থাকে। আবার এটা নিয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু এটা বাস্তব যে, সমকামিতার অস্তিত্ব আছে। সমাজে সংখ্যায় কম হলেও সাধারণ মানুষ বা বিখ্যাত মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে – এটা কম বেশি আছে। এটি বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বিশেষভাবে। যেমন ধরুন যারা সেনাবাহিনীতে আছেন – নারী বিবর্জিতভাবে বহুদিন বা দীর্ঘদিন জেলে বন্দি অবস্থায় যে সমস্ত কয়েদি তাদের মধ্যে এটা গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন ধর্মের ক্ষেত্রে - হিন্দু ধর্মের ক্ষেত্রে সাধক-সন্নাসী, মুসলিম, খ্রীস্টানদের মধ্যে যে নান উপাসক তাদের মধ্যেও এমনটা নির্দিষ্ট সংখ্যায় দেখা যাচ্ছে। তাহলে কি বিপরীত লিঙ্গের অনুপস্থিতিতে মানুষের যে জৈবিক চাহিদা, এটা না পেয়ে সমশ্রেণীর মধ্যে সেই জৈবিক চাহিদা পূরনের চেষ্টা করছে? যদি এটা দাবি করে বা যুক্তি হিসেবে খাড়া করে, তাহলে কিন্তু এটাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। আবার দেখুন – কিছু মানুষের মধ্যে সমকামিতা এবং বিপরীগামিতা - এই দুটোই কিন্তু রয়ে গেছে। অর্থাৎ পুরুষ সে স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হয় আবার পুরুষের প্রতিও আকৃষ্ট হয়। এই সংখ্যাটা কিন্তু আছে। তবে এই মুহূর্তে আমার যতটুকু জানা আছে– যে, **এটা একটা পরিস্থিতির মধ্যে বিকৃতির বহিঃপ্রকাশ। এটা সুস্থতা বলে আমার মনে হয় না।** যদি সুস্থভাবে একটা মানুষ, তার যৌবনে তার চাহিদাগুলো প্রকাশের সুযোগ পায়, সুস্থভাবে বেড়ে ওঠে, তাহলে তার ক্ষেত্রে এই সমকামিতাটা আসার সম্ভাবনা কম থাকে।

দেবাশিস ভট্টাচার্য্য (ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি)ঃ

সংক্ষিপ্ত সময়ে একটি বক্তব্যে "সমকামিতা" - এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত ডাইমেনশন আছে, তার টেকনলজি, বায়োলজি, সোসিয়োলজি, তার নৈতিকতা, তার রাজনীতি, মিডিয়ার ভূমিকা, প্রশাসন-এই সবগুলি স্পর্শ করা একটি কঠিন কাজ। তা সত্ত্বেও আমার যা মনে হয় আমি তা বলার চেষ্টা করছি।

সমকামিতা বা যৌনতার চেনা প্যার্টানটা আমরা সহজে বুঝতে পারি। সেটা আমাদের আশপাশে পরিচিতদের দেখে এবং বায়োলজিকালি সেটা বুঝতে আমাদের আজকের দিনে কোন অসুবিধা নেই। যৌনতায় কি হয়? যৌনতা জীবের বংশ বিস্তারে কাজে লাগে। সেইজন্য জীব তার পরবর্তী প্রজন্মকে যাতে সে জন্ম দিতে পারে, তার জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা (desire) তার মধ্যে তৈরী করছে – বংশ বিস্তারের জন্য যৌনতার অনুভূতি তার মধ্যে সৃষ্টি করছে। সেটা যথা সময় উপযুক্ত বয়সে তার মধ্যে প্রকাশ পায়। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন হচ্ছে - যে, মানুষের বা যৌনতা সৃষ্টির আগে জীব বিবর্তনের যে পর্ব, সেখানে যৌনতা তো প্রথমে আসেনি। প্রথমে যে জীবাণুটা ছিলো, যে নিম্নবর্গীয় প্রাণীরা ছিলো - তারা কিন্তু বংশবিস্তার করত। কিভাবে করত? একটা কোষ যেভাবে বিভাজিত হয়। একটা প্রাণী তার থেকে আর একটা প্রাণী কপি হয়ে গেল। জীবাণুরা কিন্তু অসংখ্য কপি সৃষ্টি করতে পারে, খুব দ্রুত বিভাজিত হতে পারে। এভাবে বংশবিস্তার যে কম হত তা নয়। তাহলে যৌন জননের উদ্ভব হল কেন? প্রাণীর মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ থাকতে হবে, তাদের মিলিত হতে হবে, তবে সন্তান জন্মাবে এটা তো একটা জটিলতা। এই বাড়তি জটিলতা প্রকৃতি সৃষ্টি করল কেন?

একটা সময় আমরা তা বুঝতে পারতাম না। যৌনতা ভগবানের দান, নারী-পুরুষের ভালবাসা অতিন্দ্রীয় ব্যাপার, বোঝা যায় না - এসব বলা হত। কিন্তু পরবর্তীকালে এটা ভাল করে বোঝা গেছে। ব্যাপারটা কি? বিবর্তনের কথাটা ভাবুন। একটা প্রাণী, তার দেহ কিভাবে তৈরী হবে? তার একটা জেনেটিক স্ট্রাকচার আছে। সেখানে ডি এন এ বা আর এন এ আছে। তার মধ্যে কিছু সংকেত লেখা আছে, সেখান থেকে তার দেহের অংশগুলি সব তৈরী করে পর-পর, নির্দিষ্ট একটা মেথড অনুযায়ী। কপি সৃষ্টির মাধ্যমে বংশস্তিারের ক্ষেত্রে সে কপিতে যদি তার কোন ত্রুটি থাকে, সে ত্রুটিটাই বার বার কপি হতে থাকবে। এবং কারুর যদি জিন পরিবর্তিত হয়, পরিবেশের মধ্যে টিঁকে থাকার সুবিধাজনক বৈশিষ্ট্য যদি সে অর্জন করে, তবে কেবলমাত্র সেই বৈশিষ্ট্যটুকুই তার পরবর্তী প্রজন্মে যাবে। এইরকম কপি হয় অযৌন জননের ক্ষেত্রে। কিন্তু যৌন জননের ক্ষেত্রে আমরা জানি, একটি পুরুষ ও একটি নারী মিলিত হয়। তার ফলে কি হয়? তাদের ক্রোমোজোমের লিঙ্কেজ যাকে বলে - এর ক্রোমোজোমের অর্ধেকটা ওর ক্রোমোজোমের অর্ধেকটা এসে যায়। তার ফলে যে জন্ম নিচ্ছে সে আবার বিপরীত লিঙ্গের সাথে যথাসময় মিলিত হবে। তার ফলে তার বংশধর আরও ক্রসিং হয়ে যাবে। ফলে তাদের জিনে বৈশিষ্ট্যের যে সংকেত আছে, সেই সংকেতগুলি পরপর সাফলিং - রিসাফলিং হতে থাকে। একটি প্রাণীর হয়ত একটা জিন তৈরী হয়েছে, মিউটেশনের ফলে তার চোখটা একটু ভাল। অন্য একটির মাসেলটা একটু ভাল। দু'টো যদি একজায়গায় আনা যায়, তবে সে প্রাণীটা অনেক উন্নত প্রাণী হবে। তার টিঁকে থাকার সম্ভাবনা অনেক বেশি হবে। কিন্তু এইটা অযৌন জনন দিয়ে কোনদিন হবে না। জীব বিবর্তনের পথে যৌন জননের উদ্ভবের এটা হচ্ছে বিজ্ঞান।

তাহলে সমকামিতা, যেখানে একটি পুরুষ পুরুষের প্রতি, একটি মেয়ে - মেয়ের প্রতি আকর্ষিত হচ্ছে - তার কিন্তু এই ধরণের কোন যৌন উপযোগিতা নেই। তাহলে যেটা একটা ধাঁধা তা টিঁকে আছে কেন? বিপরীত লিঙ্গের কারুর সাথে মিলিত হতে না চাইলে তো বংশ বিস্তার সম্ভব না, জিনটাও ছড়িয়ে পড়তে পারল না। বংশটা এখানেই শেষ।

এই ধাঁধাটা নিয়ে ধাঁধা সৃষ্টি করার উৎসাহ খুব বেড়ে গেছে। কিছুদিন আগে আনন্দবাজার পত্রিকায় আপনারা দেখেছেন, পথিক গুহ লিখেছিলেন। এর আগে যৌন জনন নিয়ে বিজ্ঞানীরা যে বুঝতে পেরেছেন তিনি সেটাকে অস্বীকার করে নারী-পুরুষের ভালবাসার সেই অতীন্দ্রিয়বাদে চলে গেছেন। বলেছেন – কোন যৌনতাই আজ পর্যন্ত সেভাবে বোঝা যায় নি। জানা জিনিসকে এভাবে ঘুরিয়ে দেওয়ার মানে কী? একটা জিনিস পরিস্কার করে তোলার জন্যই তো বৈজ্ঞানিক লেখা হয়, অথচ তাকে আরও ধোঁয়াটে করে তোলার জন্য এই ধরনের লেখা এখন চলছে।

আমি আগের কথায় ফিরে আসি। সমকামিতার বিষয়টি বিলুপ্ত হয়ে যায়নি কেন? আমার আগের বক্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়েছেন – যে, এমন তো হতে পারে যে সমকামিতা কোন মৌলিক প্রবৃত্তি নয়। এটা আসলে যৌন জননকে এক ধরনের নকল করা। যেখানে এটা পাওয়া যাচ্ছে না, সেখানে এইভাবে এটাকে নকল করার চেষ্টা এটা হতে পারে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে বলা হচ্ছে– বহু মানুষ আছে যারা কিনা মিলিটারি জীবন বা জেলে এই ধরনের লাইফের মধ্য দিয়ে যাননি, তবুও প্রবণতা আছে – তিনি বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন না। এজন্য তাদের জেলে ঢোকানো যাবে না। আমি মনে করি, একথার মধ্যে একটা নৈতিক বা মানবিকতার আহ্বান আছে, সেটা অস্বীকার করা যায় না। কাজেই সমকামীদের অপরাধী বলে গন্য করা উচিত নয়, তাদের জেলে ঢোকানো উচিত নয়। প্রগতিশীল মানুষ, যারা মানবাধিকারের পক্ষে লড়ছেন, তারা এই দাবী করবেন এই বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। **কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে - যারা এর পক্ষে বলছেন , তারা শুধু এইটুকু বলে থামছেন না। তারা বলছেন এটা একটা ওয়ে ওফ লাইফ। স্বাভাবিক অস্বাভাবিক বলে নাকি কিছু হয় না। যার যেটা ভাল লাগে সেটাই নাকি তার কাছে স্বাভাবিক**! এবং সেই কারণে তাদের অস্বাভাবিক বলা যাবে না। তাদের যে জীবন-যাপন - এইটা একটা সম্পূর্ণ প্যারালাল, একটা আলাদা লাইফ স্টাইল। এ ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের অনেক কিছু ভাববার আছে।

এখন যে আলোচনায় যেতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে, একটি মানুষকে আপনি বিবেচনা করুণ। তার শরীর বিবেচনা করুন। সে হয় পুরুষ অথবা নারী অথবা তার শরীরে পুরুষ বা নারীর লক্ষণ একটু অসম্পূর্ণভাবে আছে। অনেক সময়ই এর জিনগত ভিত্তি থাকে। আমরা এটা স্কুলে সকলেই পড়েছি যে, ক্রোমোজোগুলি মার থেকে একটি (X ক্রোমোজোম) এবং বাবার থেকে একটি (হয় X অথবা Y ক্রোমোজোম) সন্তান লাভ করে। দুটিই যদি X ক্রোমোজোম হয় সেটা হবে মেয়ে আর একটি X এবং একটি Y ক্রোমোজোম হলে সেটা হবে ছেলে। কিন্তু কিছু কিছু বিরল ক্ষেত্রে, যখন বাবা-মার শুক্রানু-ডিম্বানুর মিলন হয়, কোন ত্রুটির কারণে হয়ত একটা মাত্র

ক্রোমোজোম চলে এলো, আর একটা এলো না। অথবা একটি X এলো Y দুখানা চলে এলো একসঙ্গে। তিনটা X চলে এলো, চারটা X চলে এলো - খুব বিরল কিন্তু ঘটে। এরকম হলে পরে দেখা যাবে কতগুলি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে, যার সম্পূর্ণ কার্যকারণ সম্পর্ক এখনও পর্যন্ত খুব পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় নি। একটি সময় বলা হত Y যেহেতু পুরুষের ক্রোমোজোম, তাই দুটো যদি Y ক্রোমোজোম চলে আসে, সে হবে সুপার ম্যান। সে একুটু বেশি অ্যাগ্রেসিভ হবে। মারামারি করতে চাইবে, এবং একটা সময় এরকম গবেষণা হয়েছিলো – ক্রিমিনাল কাজে যুক্ত যারা, তাদের নাকি Y ক্রোমোজোম বেশি! পরবর্তী কালে এটা খারিজ হয়ে যায়। এর কোন ভিত্তি নেই। কিন্তু যদি একটি ঘাটতি পরে যায়, বা X বা Y ক্রোমোজোম যদি বেশি হয়ে যায় তাদের নানা ধরনের জেনেটিক ডিসঅর্ডার হয়। যার ফলে তাদের যৌনাঙ্গগুলি অসম্পূর্ণ থাকে। তাদেরকে আমরা হিজড়ে বলি।

এখন জিন হচ্ছে একটা স্তর। সেখান থেকে তার শরীর তৈরী হল। মেয়েদের ক্ষেত্রে উপযুক্ত বয়সে তাদের মেয়েসুলভ বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। তাদের শরীরে নির্দিষ্ট ধরনের হরমোনের আনাগোনা শুরু হয়। পুরুষের শরীরে টেস্টোস্টেরন, মেয়েদের শরীরে ইস্ট্রোজেন হরমোন। তাদের প্রভাবে দেখা যায়। এটা ঘটে বেসিক প্যাটার্নটা মেনেই।

এর পরে আসে – বিহেভিয়াল যৌনতা। অর্থাৎ কে কিভাবে যৌনতায় আচরণ করবে। জিন থেকে যত বেশি করে শরীর, তারপর তার আচরণ, তারপর তার প্রত্যাশা (expectation)–এভাবে নানা স্তর অতিক্রম করে যত যাচ্ছি, তত বেসিক কেমিষ্ট্রি থেকে যাচ্ছি সোসাইটির দিকে। নারী-পুরুষ সংগম করবার সময়, একান্ত মুহূর্তে তারা দুজন মিলে যে আচরণ করছে, সে আচরণের মধ্যে তাদের জৈবিক যে তাড়না - সেটা আছে। কিন্তু সেই মুহূর্তেও যেহেতু মানুষ সামাজিক জীব - তাদের কাছে, সমাজের কাছে এবং নিজের কাছে তার যে প্রত্যাশা, সে অনুযায়ী তারা আচরণ করছে। নানারকমভাবে এই প্রত্যাশাগুলি পাল্টে যায়। এগুলি পাল্টে দেওয়ার চেষ্টাও করা হয় অনেকভাবে। সবসময় পাল্টে যাওয়াই যে খারাপ আমি তা বলছি না। আমি বলছি জিনিসগুলি ভীষণভাবে সংস্কৃতি নির্ভর, ভীষণভাবে সোসাল বা সামাজিক।

এর পরে সামাজিক প্রত্যাশায় সে সোসাল রোল প্লে করে; সেখানে আছে জেন্ডার। একটা মেয়ে, সে শুধু যৌনভাবে একটা রোল প্লে করে তা নয়। তাকে কি করতে হবে - তাকে কি ধরনের পড়াশুনা করতে হবে - অংক-টংক তার খুব একটা হবে না, তাকে অন্য কিছু একটা করে-টরে বিয়ের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। যৌনতার স্বাভাবিক যে প্রত্যাশা তার কাছে বা তার যে বায়োলজি – সেইটার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ এবং নারীর যৌন আচরণের মধ্যে এই ধরনের সোসাল প্রত্যাশাগুলি থাকে।

কিন্তু আপনি দেখবেন গতকালে টেলিগ্রাফে - **সমকামীদের জিন খুঁজে পাওয়া গেছে বলে দাবী করা হয়েছে। এধরনের দাবি এর আগেও অসংখ্যবার হয়েছে। এগুলো শুধু যে ধোঁয়াটে গবেষণা তা নয়, এরকম গবেষণায় মাঝে মাঝে প্রচুর টাকা নষ্ট হয়। এবং শুধু আইডিয়োলজিকাল প্রুফ তৈরী করে। এছাড়া এর বিশেষ কিছু বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।** কয়েকটা জিনিসের জিন পাওয়া যায়। আমাদের চুল কোকড়া হওয়া - তার নির্দিষ্ট জিন পাওয়া গেছে। আমাদের চোখের মনির রং কি কালো, না কটা, নাকি সবুজ, না নীল এর জিন পাওয়া গেছে। এগুলো বিভিন্ন জায়গাতে বংশপরম্পরায় হয়। কিন্তু একটা কমপ্রেক্স সোসাল ফেনোমেনা, সোসিও–বায়োলজিকাল ফেনোমেনা – যৌনতা, ক্ষুধা এগুলোর কোন জিন হয় না। ওই জিনটা সরিয়ে নিলে কাল থেকে খিধে থাকবে না – চমৎকার, না খেয়ে বাঁচতে পারা - এরকম হয় না।

সমকামিতায় এই ধরনের জিন, মানুষের অপরাধ প্রবণতার জিন, বুদ্ধিমত্তার জিনের বিরাট গল্প আছে। কিন্তু এগুলো সম্ভব না। কিন্তু এগুলো ঘটছে। এবং বিজ্ঞান সংগঠন হিসেবে আমাদের উচিত – এগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা। এর মধ্যে যেখানে ধোঁয়াটে আছে, যেখানে যেখানে ঘোরানোর চেষ্টা করা হয়েছে সেগুলোর প্রতিবাদ করা। এই বিষয়টা নিয়ে আবার ভীষণরকম অযৌক্তিক চর্চা আছে। আপনি দেখতে পাবেন – ফেসবুকে, সাধারণ পত্রপত্রিকায় সর্বত্রই বার বার করে লেখা হচ্ছে। যারা এটার বিরোধিতা করছেন, সেই ধর্মীয় সংগঠন তারা বলছেন – ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে এটা খাপ খায় না। আর যারা এটাকে সমর্থন করছেন তারা বলছেন– হ্যাঁ, এটা বিরাটভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে খাপ খায়। কারণ পুরানে এই কথা আছে, অমুকে এই কথা আছে, পুরানো ভাস্কর্যে আছে ... অল বোগাস। **প্রাচীন শাস্ত্রে আছে কি নেই তাতে কি আছে? জিনিসটা যদি বিজ্ঞান সম্মত হয় তাহলে আমরা গ্রহণ করব, যদি না হয় তাহলে গ্রহণ করব না।** এটা এইভাবে আলোচনা করতে হবে। আরও অনেক কিছু – কোন জন্তু-জানোয়ারেরা এই আচরণ করে কিনা, জিনিসটা প্রাকৃতিক কি, প্রাকৃতিক নয়। আরে মানুষ কি অন্য জন্তু-জানোয়ারেরা যা করে ...। সমকামিতা প্রাকৃতিক কি

প্রাকৃতিক নয় সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে তার মধ্যে যা যা বলা হচ্ছে, যা যা দাবি করা হচ্ছে। সমকামীদের প্রতি কোন অন্যায় আচরণ করা হচ্ছে কিনা; জিনিসটায় সমাজের কোন ক্ষতি হচ্ছে কিনা। এগুলো খুব ভালভাবে, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সেন্টিমেন্টালিজম বাদ দিয়ে পার্টিজানিজম্ বাদ দিয়ে আলোচনা করা দরকার।

বর্নালী মুখার্জী (নেহাই) ঃ সমাজের যারা মাথা তারা সমস্ত কদর্য-বিকৃতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন। আমরা এইভাবে বলি – সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণভাবে নিজের মধ্যে ধারন করে নিয়েছে।

আমরা দেখতে পাই পুরাণ এবং কোনারক, খাজুরাহো মন্দিরগুলো হয়ে উঠছিলো রাজ-রাজাদের নানা ধরনের বিকৃত সংস্কৃতি চর্চা ও উপাসনা কেন্দ্র। মন্দিরগুলোতে রাজারা ও পুরোহিতরা মেয়েদের ভোগ করত। তাদের আবার নানা ধরনের নাম দিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হয়েছে যে, এর ভগবানের সেবিকা। এই সংস্কৃতিকেই সমাজের বুকে আবার নতুন করে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। কারণটা অর্থনৈতিক। আমরা জানি আজকের সমাজে মুষ্টিমেয় মানুষ তৈরী হয়েছে, ভারতবর্ষেও, তাদের মাসিক রোজগার নাকি লাখ-লাখ টাকা। তাহলে এই টাকাটা যদি সমাজে রোল করাতে হয়, প্রতিদিন বাজারে আনতে হয়, তাহলে দুটো ক্ষেত্র আছে। একটি হচ্ছে বিদেশী মদ, আর একটি হচ্ছে যৌনতা বা নারীদেহ, যেটায় প্রতিদিন খরচ করা যাবে। এই বিশাল মার্কেটটিকে যদি লিগালাইজ করা না যায়, এই মার্কেটটিকে যদি স্বাভাবিক বলে প্রতিষ্ঠিত করা না যায়, তাহলে কিন্তু মুসকিল। আমি কিন্তু এই জায়গা থেকেই আজকের আলোচনাটা দেখতে বলব।

"স্বাভাবিক – অস্বাভাবিক" বলে কিছু হয় না – একথা যারা বলার চেষ্টা করছেন, আমি মনে করি – তারা কিন্তু এলজিবিটি ঘরানার যেসব মানুষ আছেন তাদের ব্যবহার করছেন। তাদের কাঁধে বন্দুক রেখে সমাজে একটি সাংঘাতিক ফ্যাসিস্ট ডেভলপমেন্টের চেষ্টা করছেন। "স্বাভাবিক" কথাটা আমার আপনার মস্তিষ্ক প্রসুত নয়। সমস্ত কিছুর একটি ইতিহাস আছে। যৌনতার একটা ইতিহাস আছে। এবং সেটা এটা যে, প্রকৃতির ভ্যারাইটিসের প্রয়োজন ছিলো, তা না হলে আমাদের প্রয়োজন হয়নি। তাহলে আজকে যদি সেটাকে ছেড়ে দিতে হয়, তাহলে আজকে আমাকে বোঝাতে হবে – কেন আজকে মানুষের ভ্যারাইটিসের প্রয়োজন নেই।

দেবাশিস দা দেখালেন – প্রথমতঃ জেনেটিকালি কেউ প্রমাণ করতে পারেনি যে, সমকামিতা স্বাভাবিক। দ্বিতীয়তঃ ফিজিওলজিকালিও এটা প্রমাণিত হয়নি যে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু তৃতীয়তঃ যেটা থাকে, সেখানে আমরা বিভিন্ন উদাহরণ থেকে দেখতে পাচ্ছি যে, স্বাভাবিক যে জীবন মানবজাতি গ্রহণ করেছে – তা ঐতিহাসিক কারণে। সেটি যখন একজন মানুষ পাচ্ছে না, তখনই কিন্তু এই বিষয়গুলির বিকাশ করছে। তাই বলে বলছি না, এলজিবিটি ঘরানার যে সমস্ত মানুষ তাদের জেলে পুরে দিতে হবে। প্রশ্নটা এরকমও নয় – তাদেরকে হাসপাতালে পুরে দেব। বিতর্কটা সেখানে – যে পুঁজিবাদ আজকে তার অস্বাভাবিক ও বিকৃত সংস্কৃতিটা নিয়ে আসছে, তার অস্বাভাবিক ও বিকৃত অর্থনীতির কারণে, তার বিরোধিতা করতে হবে। তাদের মূল দর্শনের বিরোধিতা করতে হবে।

পার্থ সারথী মুখার্জী ঃ আমি সম্পূর্ণ একটা অন্য আঙ্গিকে এই আলোচনাটা করতে চাই। সত্তর দশকের পর থেকে একটা মতবাদ এই দুনিয়াতে চালানোর চেষ্টা হচ্ছে। সেটাকে বলা হচ্ছে – পোষ্ট মর্ডান ডকট্রিন (উত্তর আধুনিকতাবাদ)। এর প্রবক্তাদের মূলতঃ বলার লক্ষ্য হচ্ছে – আমরা এতদিন ধরে যে বলে আসছি শ্রমিকশ্রেণী, পুঁজিবাদী সমাজ – এসব কিছু নেই। ঐতিহাসিকভাবে এগুলোকে আনা হয়েছে। এইগুলোর মধ্য দিয়ে ইউরোপ সারা পৃথিবীতে তার আধিপত্য স্থাপন করার চেষ্টা করছে। শ্রেণী বলতে কিছু নেই। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা, সেটা হচ্ছে অত্যন্ত একটা বায়বীয় ফ্যাক্ট। শ্রেণী যদি না থাকে তাহলে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার দরকার আছে? এইটা করতে গিয়ে তারা করলেন কি – প্রত্যেকটা ব্র্যান্ড ন্যারেটিভের এগেনস্টে তারা একটা কাউন্টার ন্যারেটিভ আনলেন। এদের বক্তব্য হল যে, কোন জিনিসকে একদম প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখার দরকার নেই। যেটা এখন প্রযোজ্য সেটা নিয়ে তোমরা লড়াই কর। যেমন – দুর্নীতি বলতে গিয়ে এরা কিন্তু ব্যক্তিকে দুর্নীতি পরায়ণ বলছে। যে সিস্টেম দুর্নীতিটাকে তৈরী করছে তার এগেনস্টে কিন্তু এদের কোন বক্তব্য নেই। **আমার একটা প্রশ্ন যে, এটাও কি "উত্তর আধুনিকতাবাদ"? এর যারা প্রতিভূ তাদের মাথা থেকে বেড়িয়েছে যে, নর্মাল একটা যৌন জীবন – তার যে বিজ্ঞান আছে - তার বিরুদ্ধে আর একটা কাউন্টার ডকট্রিন তৈরী করা?**

এটা ঠিক যে, বহু নামী-দামী লোক – তাদের যৌন জীবন স্বাভাবিক ছিলো না, যদিও সমাজে তাদের অবদান আছে। এলজিবিটি – তাদের যৌন জীবন একটু ডিফারেন্ট হতেই পারে। কিন্তু তাকে ডেমন্সট্রেট করতে হবে কেন? এই ধরনের

পদক্ষেপ নিলে সব থেকে কাদের সুবিধা হয়? সব থেকে সুবিধা হয়, সেই কর্পোরেট মাল্টিন্যাশনালিষ্টদের, এরা কিন্তু তাদের প্রোডাক্টগুলি খুব সহজে বাজারে মার্কেটিং করতে পারে। এটাই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য। আর একটা জিনিস করা হচ্ছে – এটা কিন্তু টিভি, কাগজ, পত্রিকা সব মাধ্যম দিয়ে একেবারে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবং এটাকে স্বাভাবিক করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে - এরা সামাজিক স্বীকৃতি আদায় করতে চাইছে। এরা বলতে চাইছে – এটাই হচ্ছে স্বাভাবিক। এটা মেনে নাও। যত আপনি মেনে নেবেন - তত সুবিধা হবে। প্রত্যেকটি সমস্যা টুকুরো টুকরো হয়ে যাবে। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে কোন প্রতিবাদ প্রতিরোধ যাতে হতে না পারে, তার একটা ছক তৈরী করা হচ্ছে। এটাই হচ্ছে আমার বক্তব্য।

এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়ার প্রসঙ্গে বিভিন্ন বক্তার বক্তব্যে যেটা উঠে আসে –

●এই ভিন্ন আচরণের জন্য সমাজে যারা টর্চারের শিকার হচ্ছেন, তাদের পাশে দাঁড়ানো। ●তাদের পাশে দাঁড়ানোর ভান করে যে মিডিয়া ও অসংখ্য বুদ্ধিজীবীরা যেটা করতে চাইছেন তার বিরোধিতা করা। ●এই বিষয়টি নিয়ে অবশ্যই আরও গবেষনার অবকাশ রয়েছে। এবং●যে সমস্ত বিজ্ঞানীরা – সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, জীববিজ্ঞানী – এই নিয়ে কাজ করছেন, তাদের কাছে যাওয়া, তাদের এই ধরনের একটা ভাবনায় ভাবিত করা, তাদের ইন্টারভিউ নেওয়া, তাদের দিয়ে পত্রিকায় লেখানো, নিজেরা তথ্য সংগ্রহ করে পত্রিকাগুলোতে লেখা, লোকের কাছে প্রচার করা একান্ত দরকার।

বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষ থেকে বক্তাদের বক্তব্যের অনেকাংশের সাথে সহমত পোষণ করা হয়। বলা হয় প্রতিটি বিজ্ঞানকর্মীর বিষয়টি বোঝার দরকার যে পুঁজিবাদী সমাজ আজ মুমূর্ষু স্তরে পৌঁছেছে। যে সংকটের গভীরতায় সে পৌঁছেছে তার থেকে বেড়িয়ে আসা সম্ভব নয়। সমাজে তাই নৈরাজ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমকামিতার সংস্কৃতি নৈরাজ্যকে বাড়িয়ে তোলে। যুবসমাজকে নৈরাজ্যে ডুবিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি বিকৃতিতে ডুবিয়ে দিলে শাসকশ্রেণীরই লাভ। এও এক ধরণের যৌন সংস্কৃতির প্রচার। যা বিজ্ঞানসম্মত নয়, যা সমাজের প্রগতির পক্ষে নয় বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের উচিৎ তার বিরোধিতা করা। ■

●২২ পৃষ্ঠার পর

মনুষ্যজনিত কারণেই বিশ্ব উষ্ণায়ণ

পেট্রোলিয়াম জিওলজিস্টস্ যখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই ব্যাপারে সহমত হল তখন আর কোন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানসংস্থা থাকল না যারা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য মানুষকে দায়ী করছে না। এই বিষয় নিয়ে কাজ করছে এমন বিজ্ঞানীদের ৯৫ শতাংশেরও বেশী এই বিষয় সহমত। বিজ্ঞান নিয়ে কোন বিতর্কে এত বেশী সংখ্যক বিজ্ঞানীদের একদিকে মত দিতে সাধারণত দেখা যায় না।

কিছু অজ্ঞ, গর্বোদ্ধত মানুষ দেখা যায়, যাদের কোন বৈজ্ঞানিক হিসাবে credential নেই- বিপরীত মত পোষণ করেন। কিন্তু তারা কিছু বিক্ষিপ্তভাবে কর্মরত বিজ্ঞানীদের নিয়ে সমগ্র সমাজ, বিজ্ঞান মহল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের মত পোষণ করে গর্ব অনুভব করেন।"

['An Interestimg reading on Glodal Warming কলমে https://mail. google.com ওয়েবসাইটে প্রকাশিত একটি রচনা সমীক্ষণকে শ্রী পার্থ সারথী মুখার্জী গত ১৭ই ডিসেম্বর পাঠিয়েছেন। বিশ্ব উষ্ণায়ণ প্রসঙ্গে আমাদের ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত মতামতগুলিকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়ার জন্যই ওয়েব সাইটে প্রকাশিত তাঁর পছন্দমত রচনাটি পার্থ সারথী মুখার্জী পাঠিয়েছেন। এটিকে বিশ্ব উষ্ণায়ণ প্রসঙ্গে পাঠকের মতামত ধরে নিয়ে আমরা তা প্রকাশ করলাম। রচনাটি কিছু পরিমাণ সংক্ষিপ্ত এবং ভাবানুবাদ করে ছাপা হল। আমরা অন্যান্য পাঠকদের কাছে এই বিষয় মতামত দান করতে আহ্বান করছি। অন্যান্য মতামতগুলি আসার পর পার্থবাবুর পাঠানো রচনাটির উপর আমাদের জবাব আমরা পেশ করব। - সম্পাদকমন্ডলী, সমীক্ষণ]

নিবন্ধ

মানব সমাজে সমকামিতা কি যৌন বৈচিত্র্য?

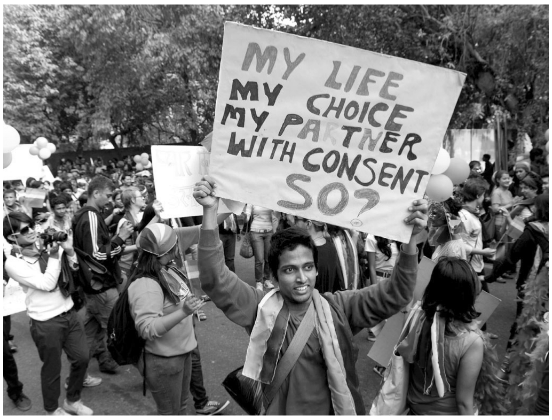

২০১৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট, ২০০৯-এর দিল্লী হাইকোর্টের, "সমলিঙ্গে যৌন ক্রিয়া দন্ডযোগ্য অপরাধ নয়" – এই রায়কে খারিজ করে দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জি এস সিংভি এবং এস জে মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে ভারতীয় সংবিধানের মানব অধিকার সংক্রান্ত ধারাগুলির সঙ্গে দিল্লী হাইকোর্টের রায় সংগতিপূর্ণ ছিল না। তারা উল্লেখ করেছেন যে পার্লামেন্ট এ বিষয়ে বিতর্ক ও সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

যৌন-প্রবণতা ও সমকামিতা সম্পর্কে বিভিন্ন দেশে আইন বিভিন্ন রকম। কোথাও সমকামিতা স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক ও আইনসিদ্ধ হিসেবে বিবেচিত। আবার কোথাও অস্বাভাবিক, প্রকৃতি বিরুদ্ধ – তাই দন্ডনীয় অপরাধ হিসাবে বিবেচিত।

সমলিঙ্গে আকর্ষণের জন্য দুধরনের বক্তব্য আছে। ১) সমকামিতা হল জন্মগত; ২) সমকামিতা হল পরিবেশ তথা সংস্কৃতির প্রভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিগত কয়েক দশক ধরে বিভিন্ন গবেষণার উল্লেখ করে প্রথম তত্ত্বটি অর্থাৎ "সমকামিতা জন্মগত" তা প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চলেছে। ১৯৪০-এর শেষ দিকে বিখ্যাত যৌন গবেষক আলফ্রেড কিনসে ৪৫০ জনেরও বেশী সমকামীর জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ ও অনুসন্ধান করে বলেছিলেন যে, সমকামিতা সহজে সারান সম্ভব কারণ এই বিশ্বাসে স্থির ছিলেন যে সমকামিতার সঙ্গে বংশগতির কোনও সম্পর্ক প্রমাণিত হয় নি। ১৯৯০-এর দশকে মুষ্টিমেয় কিছু গবেষণায় দাবি করা হয় সমকামিতার বায়োলজিক্যাল কারণ আছে। এই গবেষণাগুলি হল ১) মস্তিষ্ক গঠন নিয়ে সাইমন লে ভেগ এবং অন্য কয়েকজনার গবেষণা। ২) জে এম বেইলে এবং রিচার্ড সি পিলেরেড-এর যমজ সন্তান সংক্রান্ত গবেষণা। ৩) ডিন এইচ হ্যামার এবং তাঁর অনুগামীদের জিন সংক্রান্ত গবেষণা।

এই গবেষণাগুলির কোনটাই যৌন প্রবণতার সঙ্গে মানুষের মস্তিষ্ক, জিন বা ক্রোমোজোমের কার্যকারণ সম্পর্ক অনুসন্ধানের নিরিখে হয় নি। এগুলি ছিল কিছু পরিসংখ্যান বা তথ্যের উপর ভিত্তি করে আপাত কল্পিত মতামত। এই মতামতগুলির প্রত্যেকটিই পরবর্তী সময়ে খারিজ হয়েছে। এই সব তত্ত্বের প্রবক্তারা কখনো শুধুমাত্র পুরুষের যৌন প্রবণতা আবার কখনো শুধুমাত্র মহিলাদের যৌন প্রবণতার কারণ নির্ধারণের দাবিদার হয়ে উঠেছেন। এই সব মত এর প্রবক্তাদের বেশীরভাগ কিন্তু যৌন প্রবণতার ক্ষেত্রে পরিবেশ তথা সমাজ-সংস্কৃতির প্রভাবের সম্ভাবনাকে মেনে নিয়েছেন এবং প্রচার মাধ্যমের মিথ্যা প্রচারের বিরোধিতা করেছেন।

সমকামিতা ও যৌন প্রবণতার সঙ্গে মস্তিষ্ক গঠন-এর সম্পর্কের বিষয় প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা প্রসঙ্গে বিজ্ঞানী লে ভাগ বলেন –

"It's important to stress what I did not find. I did not prove that homosexuality is genetic or find a genetic cause for being gay. I did not show that gay men are born that way, the most common mistake people make in interpreting my work. Nor did I locate a gay center in brain. ... Since I looked at adult brain we don't know if the differences found were there at birth, or if they appeared later."

বিজ্ঞানী বাইন এবং পারসন বলেন যমজ সন্তানদের ক্ষেত্রেও সমকামিতার জন্য জেনেটিকস্ অপেক্ষা পরিবেশগত কারণই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের কথায় –

"We must at least consider the possibility that the heigher concardence rate for homosexuality in dizygotic twins compared with the non twin biologic brothers is due to increased similarity of the trait-relevant environment in the former. This is because dizygotic twins and full biologic siblings share the same portion of the genetic materials. Thus, any difference in the two concordance rates would be attributable to environmental rather than genetic factors"

যমজ সন্তানদের নিয়ে সমকামিতার বিষয়ে যে বক্তব্য পেশ করা হয়েছিল তাতে মোনোজাইগোটিক যমজদের ক্ষেত্রেই সমকামিতার হার সর্বাধিক ছিল – তা ছিল ৫২%। এই প্রসঙ্গে ড. জেফরি স্যাটিনোভার লেখেন " ... in order for something to be genetically determined, as opposed to merely influenced, the genetic heritability would need to be 100 percent."

যাঁর গবেষণাকে কেন্দ্র করে, "গে জিন" আবিষ্কার হয়েছে বলে সংবাদমাধ্যম ব্যাপক প্রচার করেছিল সেই বিজ্ঞানী এইচ হ্যামার-এর বক্তব্য হল –

"At present, we can not say nothing about the fraction of all instance of male homosexuality that are related or unrelated to the X_q^{28} Candidate locus ..."

হ্যামার আবার যৌন প্রবণতার সঙ্গে পরিবেশ ও সংস্কৃতির কথা মাথায় রেখে বলেছেন –

"Given the overall compexity of human sexuality, it is not surprising that a single genetic locus does not account for all of the observed variability. Sibpairs that are discordant at X_q^{28} should provide a usefull resource for identifing additional genes or environmental, experimential or cultural factors (or some combination of these) that infulence the development of male sexual orientation."

সুতরাং দেখা গেল যে যাদের গবেষণার ভিত্তিতে সমকামিতার বায়োলজিক সম্পর্ক নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের এত হৈ চৈ, তারা নিজেরাই সমকামিতার সঙ্গে জিনগত সম্পর্ক অপেক্ষা পরিবেশ তথা সংস্কৃতির প্রভাবের গুরুত্ব অধিক তা অস্বীকার করতে পারেন নি।

সমকামিতা কি এপিজেনেটিক ?

২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে, 'কোয়ার্টার্লি রিভিউ অফ বায়োলজি'-তে প্রকাশিত হয় – "Homosexuality as consequence of epigenetically canalized sexual development." এটি একটি তত্ত্বগত ধারণা। এই তত্ত্বের প্রবক্তাদের বক্তব্য হল, সমকামিতার ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব অভিজ্ঞতা মূলক জ্ঞান দ্বারা পরীক্ষিত।

কিন্তু এপিজেনেটিক-এর অর্থ হল – যে প্রক্রিয়া দ্বারা জিন তাদের ফিনোটাইপ ফলাফল বহন করে তার গবেষণা। যৌন প্রবণতা সম্পর্কে যেখানে এখনো পর্যন্ত কোন জিনের সম্পর্ক নির্ধারণ করা যায় নি – সেখানে এ ধরনের তত্ত্ব প্রকাশ করা কাল্পনিক জগতে বিচরণ করার নিদর্শন ছাড়া কিছুই না।

যৌন প্রবণতাকে হরমোন কতটা প্রভাবিত করে ?

১৯৪০ থেকে ১৯৭০-এর দশকের শেষ পর্যন্ত বারে বারে, যৌন প্রবণতার জন্য হরমোনের আধিক্য ও স্বল্পতাকে কারণ স্বরূপ উত্থাপন করা হয়েছে। দাবি করা হয়েছে পুরুষ যৌন হরমোন টেসটোস্টেরন পুরুষের মধ্যে অভাব থাকলে পুরুষ সমকামী এবং মহিলাদের মধ্যে টেসটোস্টেরনের প্রাচুর্য থাকলে তারা সমকামী হয়। এই বিষয়ে বিজ্ঞানী বাইন এবং পারসনস-এর মন্তব্য হল, যৌন প্রবণতাকে প্রভাবিত করার জন্য হরমোন চিকিৎসার ব্যর্থতা এবং প্রাপ্ত-বয়স্কদের হরমোন মাত্রা ও যৌন প্রবণতার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের বেশীরভাগ গবেষণা ব্যর্থ হওয়ার পরেও কি যৌন প্রবণতার জন্য হরমোনকে কারণ স্বরূপ হাজির করা যায়! প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে হরমোন তত্ত্ব খারিজ হওয়ার পরে, মাতৃগর্ভে থাকাকালীন অর্থাৎ ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্বে শিশুর হরমোনমাত্রাকে প্রাপ্ত বয়সে যৌন প্রবণতার কারণ স্বরূপ হাজির করা হয়। কিন্তু এই চেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

বাস্তবে জটিল মূল্যায়নে জানা গেছে যে মানুষের মেজাজ ও ব্যক্তিত্ব – এই বৈশিষ্ট দুটি গড়ে ওঠে পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে যেখানে কোনও ব্যক্তির যৌনতা উদ্ভুত হয়।

বিবর্তনের ধারায় সমকামিতার স্থান কোথায় ?

বিবর্তনের পথে ক্রমশ নতুন উন্নত মানের জীবের আবির্ভাব ঘটেছে। এই উন্নতমানের জীবের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বংশবিস্তার ঘটে যৌন জননের মাধ্যমে। যৌন জনন

এমন একটি পদ্ধতি যেখানে একই প্রজাতির দুটি বিপরীত লিঙ্গের প্রাণীর প্রয়োজন হয়। এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ঠিক পূর্বে উভয়ের শরীরের জনন কোষগুলির হ্যাপ্লয়েড বিভাজন ঘটে যেখানে ক্রশিং ওভারের মাধ্যমে ক্রোম্যাটিড খন্ড তথা জিনের আদান-প্রদান ঘটে। এইরূপ, জিনের পুনর্বিন্যাস সম্মিলিত দুটি হ্যাপলয়েড জনন কোষের মিলনে নতুন ডিপ্লয়েড জাইগোট উৎপন্ন হয় – যা আগামীতে জিনের পুনর্বিন্যাসের ধারাবাহিকতাকে বজায় রেখে উন্নত প্রগতিশীল জীব বিবর্তনের ধারা অব্যাহত রাখে।

বিজ্ঞানী বারানস 'গে জিন' তত্ত্বের মূলগত বিরোধিতা করে বলেন জেনেটিক হাইপোথিসিস-এর পক্ষে সমর্থন করা আরো জটিল হয়ে পরে সংস্কৃতির প্রভাব ও বিবর্তনবাদকে বিবেচনা করলে। একথা সত্যি যে মানুষের সেক্সুয়াল প্যাটার্ন কিছুমাত্রায় হলেও সাংস্কৃতিক চাহিদার ফল। কিন্তু এটা বিবেচনা করা খুব কঠিন যে সাফল্যে সঙ্গে জেনেটিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক পরিবেশে সাড়া দিয়ে হয়। আবার বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে জেনেটিক্যালি নির্ধারিত সমকামিতা অবশ্যম্ভাবি রূপে বিলুপ্ত হয়ে যেত বহু পূর্বেই – পরবর্তী প্রজন্ম সৃষ্টির অভাবে। সুতরাং জেনেটিক ও হোমোসেক্সুয়ালিটি'র মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টাই যুক্তিহীন। মানুষের যৌন প্রবণতার মত জটিল বিষয় শুধুমাত্র একটি জিন বা শুধুমাত্র জিনের কার্যকলাপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া অসম্ভব।" গবেষক বেম সমকামিতার তত্ত্ব সম্পর্কে বলেছেন যে **এই ঘটনা বিবর্তনের অনিয়ম** এবং প্রশ্ন রেখেছেন, – "How do lesbians and gay men manage to pass on their gene-pool to successive generations?"

প্রাণী জগতের সমকামিতা কি মানব সমাজে প্রযোজ্য ?

প্রাণী জগতে সমকামিতার উপস্থিতিকে দেখিয়ে সমকামিতা যে প্রকৃতি বিরুদ্ধ নয় এই তত্ত্ব অনেকে হাজির করেন এবং মানব সমাজে সমকামিতাকে আইন সিদ্ধভাবে গ্রহণের পক্ষে মত রাখেন। বৈজ্ঞানিক ব্রুক বাগেমিল-এর মতে বৈজ্ঞানিক সমাজবদ্ধ মানব প্রজাতি অপেক্ষা প্রাণী জগতে যৌন প্রবণতার বৈচিত্র অনেক বেশী, তথাপি মানব সমাজের জন্য এবিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। অথচ প্রাণী জগতের সমকামিতার উদাহরণ প্রমাণ স্বরূপ খাড়া করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট সে দেশের ১৪টি রাষ্ট্রে সমকামিতা বিরোধী আইন তুলে দিয়েছে।

সাইমন লিভে বলেছেন যে সমকামী আচরণ প্রাণীদের মধ্যে খুব স্বাভাবিক, কিন্তু এটা খুব অস্বাভাবিক যে কোনও প্রজাতির একটি প্রাণী অপর একটি প্রাণীর সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ীভাবে বন্ধনে আবদ্ধ থেকেছে – বিপরীত যৌন সম্পর্ক ব্যতিত। এই কারণেই অনেকের মতে **প্রাণী জগতে বিশুদ্ধ সমকামী – বিরল বিষয়**। প্রাণী জগতে সমকামী শব্দটির ব্যবহার বিতর্কিত দুটি কারণে – ১) প্রাণীদের যৌনতা ও যৌন প্রবণতা সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞান সীমিত এবং ২) সমকামী এই শব্দটির সঙ্গে ওয়েস্টার্ন সোসাইটি'র সংস্কৃতি দৃঢ়ভাবে সম্পর্কিত যা মানুষ ব্যতিত অন্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

অধিকাংশ প্রাণীর ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে শুধুমাত্র সমকামী – এরূপ চিহ্নিত করা যায় নি। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তারা উভয়কামী। এখন, মানুষের বিবর্তন তো শুধুই প্রকৃতি নির্ভর নয়। মানুষের সমাজ আছে, সভ্যতা আছে, সংস্কৃতি আছে, উৎপাদনের উপায় উপকরণ আছে, আছে আরও অনেক কিছু – যা প্রাণীজগতের অন্য কোনও প্রজাতির নেই। মানুষের আচার-আচরণ-স্বভাব-চরিত্র কি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার প্রতিফলন, নাকি সভ্যতা-সমাজ-সংস্কৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত? প্রকৃতির ডাককে নিয়ন্ত্রণ করেই মানুষ একগামী হয়েছে। **যারা সভ্যতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রাণী জগতের সমকামিতার উদাহরণ দিয়ে মানব সমাজে তার স্বীকৃতি দাবি করছেন – তারা তো প্রাণী জগতের বহুগামিতার নিদর্শন তুলে মানব সমাজে বহুগামিতার স্বীকৃতি দাবি করতে পারেন!** এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই থাকবে না। তাঁরা কি জানেন না যে "ধর্ষণ" শব্দটা শুধুমাত্র মানব সমাজে সভ্যতার বিকাশের একটা পর্যায়ে এসে নিন্দনীয় ও বর্জনীয় বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। প্রাণীজগতে মানুষ ভিন্ন অন্য প্রাণীদের পরিবার নাই – বিবাহ নাই – আছে শুধু অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যৌন ক্রিয়া – ধর্ষণের বোধ নাই – যা শুধুমাত্র সমাজ সংস্কৃতিই সৃষ্টি করতে পারে। যে প্রগতিশীল সংস্কৃতি ধর্ষণকে নিন্দনীয় ও বর্জনীয় ঘোষণা করেছে, সেই প্রগতিশীল সংস্কৃতির অনুশীলনকারী মানুষ কি প্রাণী জগতে সমকামিতার উদাহরণকে খাড়া করে সমাকামিতাকে যৌন বৈচিত্র আখ্যা দিয়ে প্রকাশ্যে বা গোপনে সমকামী যৌন সম্পর্ককে মান্যতা দিতে পারে?

মানব সমাজে সমকামিতা

মানুষের সমলিঙ্গে যৌন আকর্ষণ এবং যৌন আচার ব্যবহার প্রসঙ্গে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে মারিয়া কার্ফবাগ 'সমকামী'

শব্দটি উদ্ভাবন করেন। যৌন আচরণ ও সমকামিতার বিষয় প্লেটোর দার্শনিক যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত তা বহুল আলোচিত। ধর্মকে ভিত্তি করে, "প্রকৃতির নিয়ম"-এর ধারনা ও ব্যাখ্যা থেকে পশ্চিমের দেশগুলিতে এক সময় সমকামিতা নিষিদ্ধ ছিল। সমলিঙ্গে যৌন প্রবণতাকে আইনত গ্রহণযোগ্য বা বর্জনীয় করার বিষয়, "পছন্দ ও প্রাধান্য" এবং "প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ" – মতবাদ দুটির মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। গ্রহণ বা বর্জন কোনটাই বৈজ্ঞানিক নীতির ভিত্তিতে হয় নি।

প্রাচীন গ্রীসে মহিলা, অল্পবয়সী ছেলেরা যাদের দাড়ি ওঠেনি এবং ক্রীতদাসরা যৌন সম্পর্কের বিষয়ে নিষ্ক্রিয় থাকত – কারণ তারা সমাজে নাগরিক বলে গণ্য হত না। মধ্যযুগে গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশে সমকামিতা বা উভয়কামিতা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে ছিল গর্হিত সম্পর্ক, অথচ অভিজাত শ্রেণী ও উচ্চ পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রায়ই সমকামী তথা উভয়কামী সম্পর্ক দেখা যেত।

ঊনিশ শতকে সমলিঙ্গে যৌন আকর্ষণ ও সম্পর্কের বিষয় উল্লেখযোগ্যভাবে আইনি দন্ড হ্রাস পায়। নেপোলিয়নের বিচার ব্যবস্থা সমকামিতাকে নিরপরাধ ঘোষণা করে এবং এর পক্ষে প্রচার করে।

বিংশ শতাব্দীতে যৌন প্রবণতা ও যৌন সম্পর্কের বিষয় পুনর্মূল্যায়ন হয়। বিবাহ বহির্ভূত জীবনে যৌন সম্পর্ক সাধারণ বিষয় রূপে উঠে আসে। বিবাহ বহির্ভূত জীবনে যৌন সম্পর্কের বিষয়ে আইনি নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। এই রকম অবস্থায় সমকামিতার অধিকার সামাজিক স্বীকৃতি দাবি করে। ১৯৬০-এর দশকে আমেরিকায় সমকামীদের মুক্তি আন্দোলন শুরু হয়। যদিও এর কয়েক দশক পূর্ব থেকেই গে এবং লেসবিয়ান অধিকার রক্ষার সংগঠনগুলি ধীরে ধীরে তাদের অধিকার গণ্য করানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। ১৯৬৯-এর ২৮শে জুন নিউইয়র্কের গ্রীণউইচ ভিলেজে একটি গে বার-এ পুলিশী অভিযানের ফলে সংঘর্ষ বেধে যায় এবং দেশ জুড়ে সমকামীদের আন্দোলন ছড়িয়ে পরে।

সমকামিতার চিকিৎসা ও বর্তমান অবস্থা

প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ এবং ডাক্তার সিগমুন্ড ফ্রয়েড বলেছিলেন সমকামিতা কখনো কখনো সম্মোহনকারী উপদেশ দ্বারা দূর করা যায়। কিন্তু ১৯২০ দশকে তিনি বলেন যে সমকামীকে বিপরীতকামীতে পরিণত করার ক্ষেত্রে যে সামান্য সাফল্য পাওয়া গেছে তাহল এই রূপ যে সমকামী ব্যক্তি সমকামিতা বর্জন না করে বিপরীতকামী হয়েছে – অর্থাৎ উভয়কামীতে পরিণত হয়েছে।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকান সাইক্রিয়াটিক অ্যাসোসিয়েশনস ডায়াগনোস্টিক অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিক্যাল ম্যানুয়াল অফ মেন্টাল ডিসঅর্ডারস-এর প্রথম সংস্করণে সমকামিতাকে মানসিক ব্যধি বলে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৩৯ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত সমকামিতার চিকিৎসা রূপে কনভারশন থেরাপি স্বীকৃতি লাভ করেছিল। কিন্তু, "সমকামিতা-এক প্রকার অসুস্থতা" – এই বক্তব্য ১৯৫০-এর দশক থেকেই সমালোচনার সম্মুখীন হয়। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে চিকিৎসা বিজ্ঞানী এভেলিন হুকার বলেন, "... there is no difference between homosexual and heterosexual men in terms of pathology." আবার এই বিষয়ে ১৯৬৬ সালে বিজ্ঞানী এম পি ফেল্ডমান-এর গবেষণা নিয়ে প্রকাশিত "Aversion therapy for sexual deviation a critical review"-তে ৫৮% সুস্থ হওয়ার দাবি করা হয়। ১৯৬৯ সালে গে বার-এ পুলিশী অভিযানের পরেই, গে রাইটস আন্দোলন কনভারশন থেরাপি বন্ধ করার আন্দোলনে পরিণত হয়। কনভার্সন থেরাপি'র ব্যাপক সমালোচনার পর আমেরিকান সাইক্রিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশন (এপিএ) সমকামিতাকে মানসিক রোগের তালিকা থেকে বাদ দেয়। সমালোচকদের মতে গে অ্যাক্টিভিস্টদের চাপে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে এপিএ'র সদস্যদের ৫৮% ভোটে "সমকামিতা মানসিক রোগ নয়" বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় – যা সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে নয়।

কোনও বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত কি ভোটের মাধ্যমে গ্রহণ বা বর্জন করা উচিত? ১৯৮০-এর দশকের শেষ পর্যায় কনভারশন থেরাপি'র নতুন উপায় রিপারেটিভ থেরাপি শুরু হয়।

১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা হু, "মানসিক বিকৃতির" তালিকা থেকে সমকামিতাকে বাদ দিয়েছে। এরপর জাপান, চীন, থাইল্যান্ড একে একে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। কিন্তু রিপারেটিভ থেরাপি এবং সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন কনভারশন প্রক্রিয়া ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পরে আমেরিকা ও ইউরোপে। এই থেরাপি পরিচালক গ্রুপগুলিকে সমর্থন এবং প্রায় সম্পূর্ণ অর্থ সাহায্য করত বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন যারা সমকামীদের সমভাবে ধর্মীয় ও নাগরিক অধিকার দিতে আপত্তি করত। ১৯৯৮ খ্রি এপিএ – "সমকামিতা এক প্রকার মানসিক ব্যাধী" – এই অনুমানের ভিত্তিতে চিকিৎসার বিরোধিতা করে। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে আরও

এক ধাপ এগিয়ে সাধারণ নীতি স্বরূপ ঘোষণা করে যে, কোনও চিকিৎসক চিকিৎসার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে না, কিন্তু নৈতিকভাবে চিকিৎসকদের যৌন প্রবণতা পরিবর্তনের চেষ্টা থেকে বিরত থাকতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আরও বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল পাওয়া যাচ্ছে। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন সেনাবাহিনীর সার্জেন ডেভিড স্যাচার এক রিপোর্টে বলেন, "There is not valid scientific evidence that sexual orientation can be changed." ঐ বছর রবার্ট স্পিৎজার 'দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট'-এ প্রকাশ করেন যে কিছু গে, বিপরিতকামীতে পরিণত হয়েছে এবং এই ঘটনা স্বীকৃতি লাভ করা উচিত। ২০০৭-এ এপিএ রিপেয়ারেটিভ থেরাপির পুর্ণমূল্যায়ণের জন্য চাপ দেয়। ২০০৮ সালে গে অক্টিভিস্টরা এই থেরাপির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বলেন, ধর্মীয় অধিকারের ভিত্তিতে সাধারণের সম্পর্ক বিচার করা এবং তাকে বৈধ বলে বিবেচনা করানোর চেষ্টা চলছে।

২০১১ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী অ্যাটর্নি জেনারেল অফ ইউ এস একটি পত্রের মাধ্যমে মার্কিন প্রতিনিধিসভার স্পিকারকে জানিয়েছেন যে, যেহেতু যৌন প্রবণতা কোনও দৃশ্যত পরিচয় জ্ঞাপক চিহ্ন বহন করে না, সেহেতু এমন একটা মত গৃহীত হয়েছে যে যৌন প্রবণতা এমন একটা বৈশিষ্ট যা অপরিবর্তনীয়। ২০১২-এ প্যান আমেরিকান হেলথ অর্গানাইজেশন সমকামীদের যৌন প্রবণতা পরিবর্তনের চেষ্টা করার বিষয় সতর্ক করে দিয়েছে এই বলে যে চিকিৎসা প্রাপ্তদের স্বাস্থ্য বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে এবং বিশ্ব বৈজ্ঞানিক মত হল "সমকামিতা" মানুষের যৌন প্রবণতার স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক বিভিন্নতা এবং একে কখনোই রোগ বলে গণ্য করা যাবে না। হু এই বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছে। এরপর হু অনুমোদন করে যে কনভারশন-এর ঘটনা ঘটলে প্রকাশ্যে অভিযুক্ত করা হবে এবং এই আইন অমান্য করলে শাস্তি প্রদান করা হবে। নৈতিক স্বাস্থ্য নীতি ও মানবাধিকার ভঙ্গের জন্য। প্যান আমেরিকার সরকার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পেশাগত কর্মক্ষেত্র এবং প্রচার মাধ্যমকে এর অনুকূলে অনুশীলন করতে বলেছে এবং এই যৌন বৈচিত্রকে (!) সম্মান জানাতে বলেছে।

২০১২ খ্রিস্টাব্দে স্পিৎজার তার কনভারশন থেরাপি প্রত্যাহার করে নেন এবং গে কমিটির কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন অপ্রমাণিত রিপারেটিভ থেরাপি প্রয়োগের দাবি করার জন্য। এক্সোডাস ইন্টারন্যাশনাল – যারা এক সময় এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করত – ২০১৩ সালের জুন মাসে এক বিবৃতিতে তাদের চিকিৎসা পদ্ধতি পরিত্যাগ করা এবং এলজিবিটি'দের উপর তাদের চিকিৎসার জন্য যে ক্ষতি হয়েছে তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেয়।

ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর রিসার্চ অ্যান্ড থেরাপি অফ হোমোসেক্সুয়ালিটি (এন এ আর টি এইচ)-এর বক্তব্য – যদি কোনও সমকামী ব্যক্তি নিজেকে পরিবর্তন করার জন্য কনভারশন থেরাপি চায় – তবে তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং তাকে বলতে হবে যে তাকে সমকামী পরিচয়ই দাবি করতে হবে কারণ কনভারশন থেরাপি নীতিগতভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

সমকামিতার পক্ষে কোনও বায়োলজিক কারণ প্রমাণিত না হওয়া সত্ত্বেও ইউরোপ ও আমেরিকায় বিগত কয়েক দশক ধরে সমকামী-সম্পর্ককে আইনীভাবে সামাজিক অধিকার দেওয়ার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেল। এই প্রসঙ্গে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে ১৭ই ডিসেম্বর নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর "ওপিনিয়ন অ্যান্ড এডিটোরিয়াল" এর পাতায় বিজ্ঞানী বাইন এবং পারসনস মন্তব্য করেন, সমকামিতার বায়োলজিক কারণের জন্য শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক যুক্তি প্রদান করা হচ্ছে। বলা হয়, যদি যৌন প্রবণতা তথা সমকামিতা একটি বায়োলজিক্যাল কারণের সঙ্গে বিশদভাবে সম্পর্কিত হয় তবে সমাজে আজ যারা উপযোগী নয় তাদের উপযোগী করার কথা ভাবতে হবে – অর্থাৎ সমাজের নিয়মকানুন পরিবর্তনের কথা ভাবতে হবে।

এল জি বি টি – এদের প্রতি সাধারণের আচরণ

এল – লেসবিয়ান, জি – গে এরা হল সমকামী। আর বি – বাইসেক্সুয়াল এবং টি – ট্রান্সজেন্ডার। বায়োলজিতে বাইসেক্সুয়াল হওয়ার কারণ হল ক্রোমোজোমের গঠন ঠিকঠাক না হওয়া। আর ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার কারণ হল ক্রোমোজোমের ঠিকঠাক কাজ না করা। কিন্তু এলজিবিটি'র বাইসেক্সুয়াল হল উভয়কামিতা অর্থাৎ যারা নারী ও পুরুষ উভয়ের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করে। এটা তো পরিষ্কারভাবে যৌন উন্মাদনার বহিঃপ্রকাশ। সভ্য সমাজে যা খুশী, যা ভাল লাগে তাই করা যায় কি? তাহলে তো ধর্ষণকে অপরাধ বলা উচিত নয়।

এদের সকলকে কি এক শ্রেণীতে ফেলা যায়? অবশ্যই না। বায়োলজিক বাইসেক্সুয়াল এবং ট্রান্সজেন্ডার – এদের মধ্যে যাদের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসায় সুস্থ্য করা সম্ভব – সরকারি

খরচে তাদের চিকিৎসা করা দরকার। বায়োলজিক বাইসেক্সুয়াল এবং ট্রান্সজেন্ডা'দের সাধারণের ন্যায় সমস্ত সামাজিক অধিকার দান করা প্রয়োজন। তাদের পৃথক শ্রেণীরূপে চিহ্নিত না করা, সমস্তরকম সামাজিক কাজে তাদের যুক্ত করা প্রয়োজন।

মানুষের যৌন প্রবণতার উপর সাংস্কৃতিক প্রভাবকে অগ্রাহ্য করে সমাকামিতাকে যৌন বৈচিত্র আখ্যা দিয়ে সমকামীদের পৃথক শ্রেণী রূপে চিহ্নিত করা কতদূর বিজ্ঞান সম্মত? যাই হোক, যেহেতু সমকামীরা সমকামিতার জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী নয় সেহেতু স্কুল-কলেজ-কর্মক্ষেত্র সর্বত্র সাধারণের সঙ্গে সমান অধিকার পাওয়ার যোগ্য। সমকামী ও বিপরীতকামী – সব রকমের যৌন সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার বন্ধ হওয়া উচিত। ঠিক এই কারণেই সমকামী বা উভয়কামীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মিছিল-মিটিং নিষিদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষা করা এবং পারিবারিক বংশ রক্ষা করা এক বিষয় নয়। বিদ্যমান সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উত্তরাধিকারের প্রয়োজনেই পারিবারিক বংশ রক্ষার জন্য বিবাহ প্রথার উদ্ভব। মানুষের ক্ষেত্রে এই পারিবারিক বংশ রক্ষার মধ্য দিয়েই প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষা হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা ভিত্তিক সমাজের পরিবর্তন ঘটলেই পারিবারিক বংশ রক্ষার প্রয়োজনের বিলোপ ঘটবে এবং মানব প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বিবাহ প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। সমলিঙ্গে বিবাহ – এই প্রয়োজনীয়তা কোনও অবস্থাতেই তা মেটাতে পারে না। তাই সমলিঙ্গে বিবাহের বাস্তবতা নাই। বিবাহ বহির্ভূত জীবনে সমলিঙ্গে বা বিপরীত লিঙ্গে যৌন ক্রিয়া সভ্যতার প্রগতিশীল পথের পরিপন্থী। বুদ্ধিজীবীদের একাংশ বলেছেন সমকামীদের মধ্যে নীবিড় বন্ধুত্ব লক্ষ্য করা যায় – যা বিপরীতকামীদের মধ্যে বিরল। জানা দরকার বন্ধুত্ব আর যৌন সম্পর্ক এক জিনিস নয়। স্বামী-স্ত্রী'র মধ্যে যৌন সম্পর্কের উপর বন্ধুত্ব নির্ভর করে না। বরঞ্চ বিপরীতটাই সত্য। অনেক সময় যৌন-সম্পর্ক কেনাবেচা যায়, কিন্তু বন্ধুত্ব কেনাবেচা যায় না। বন্ধুত্বে বিশ্বাসঘাতকতা – বন্ধুত্বের অনুপস্থিতিকেই প্রকাশ করে। দেশে দেশে বিপ্লবীদের বন্ধুত্বের গভীরতা কি যৌন সম্পর্কের উপর নির্ভর করত?

সমকামিতা কি যৌন বৈচিত্র !

ঐতিহাসিক যুগ থেকে মানব সমাজে সমকামী – বলা ভাল উভয়কামীর কিছু কিছু উদাহরণ পাওয়া যায় – যা থেকে বলা যায় মানব সভ্যতার এই প্রবণতা প্রাচীন কিন্তু প্রধান ও ব্যাপক ছিল না। আধুনিক যুগে, মনোবিজ্ঞানীদের মতে সাধারণভাবে নারীর পুরুষের প্রতি বা পুরুষের নারীর প্রতি যৌন চাহিদা থাকা সত্বেও তা যদি মেটার উপায় না থাকে, তখন সেই অপূর্ণ চাহিদা মেটার জায়গা হয় সমলিঙ্গের মধ্যে। বাস্তবে দেখা যায় সেনাবাহিনীর মধ্যে, হিন্দু ও খ্রীস্টান সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসীনীদের মধ্যে, বহুরাষ্ট্রীয় কোম্পানিগুলির কর্মচারীদের মধ্যে এই প্রবণতার ব্যাপকতা। ইকনমিক টাইমস (১২.১২.২০১৩)-এ প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায় ইনফোসিসের ৫ থেকে ১০% কর্মী সমকামী।

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও নারীর মত প্রকাশ তথা যৌন চাহিদা যৌন প্রবণতা প্রকাশ ও পূরন করা সামাজিক রীতি বিরুদ্ধ ছিল। উপরন্তু পুরুষের বহু-বিবাহ সমাজ স্বীকৃত ছিল। রাজা-বাদশা-সম্রাটদের পক্ষে তাদের বহু পত্নীর যৌন চাহিদা নিয়মিত পূরণ করা বাস্তবিক সম্ভব ছিল না। তাই এই বহু পত্নীদের সমকামী হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল – যদিও তা অপ্রকাশিত থাকত। পুরুষদের বহুগামিতা সমাজ স্বীকৃত থাকায় এবং পুরুষতন্ত্রের কর্তৃত্ব থাকায় ইতিহাসে সমকামী তথা উভয়কামিতার বিষয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উদাহরণ স্বরূপ প্রভাবশালী পুরুষদেরই নাম পাওয়া যায়।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস থেকে পাওয়া যায় যে দাসযুগ ও সামন্তযুগে এই প্রবণতা বিশেষত উভয়কামিতা সমাজের মালিকশ্রেণীর মধ্যে বিদ্যমান ছিল – যারা সামাজিক উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকত। সেই যুগে মালিকশ্রেণীর হাতে সঞ্চিত প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সৃষ্টি করেছিল তাদের বিলাস বহুল জীবন। এই বিলাস বহুল জীবন নিয়ে আসে ভোগ সর্বস্ব সংস্কৃতি যা জন্ম দেয় যৌন ব্যাভিচারের।

গত দেড়শ বছর ধরে বিশ্বের উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিতে (আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি) সমকামীরা প্রকাশ্যে এসে তাদের যৌন প্রবণতা এবং সমলিঙ্গে বিবাহের অধিকারের দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত করেছে। এই আন্দোলন ক্রমশ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে – ভারতেও তা শুরু হয়েছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী বা আইন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তাদের দাবিকে কোথাও খারিজ করেছে, আবার কোথাও স্বীকৃতি দিয়েছে। বৃটিশ ভারতে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ইন্ডিয়ান পেনাল কোড-এর ১৬ অধ্যায়ের সেকসন ৩৭৭-এ সমকামিতাকে অপরাধমূলক বলা হয় কারণ, এটা 'প্রকৃতির

নিয়ম বিরুদ্ধ' (এগেইনস্ট্ দ্য অর্ডার অফ নেচার)।

যখন ভারতে এই আইন প্রণয়ন হয় তখন ভারতে এই রূপ অধিকার দাবি করার অবস্থা সৃষ্টি হয় নি। বৃটিশরা তাদের দেশের অভিজ্ঞতা থেকেই এদেশে এই আইন প্রণয়ন করেছিল। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০০১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই দীর্ঘ ১৪০ বছরে ভারতে সামন্ত উৎপাদন ব্যবস্থা প্রথমে ধীরে ধীরে এবং শেষ পর্যায়ে দ্রুত পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে। ইতিহাস থেকে দেখা যায় পুঁজিবাদী যুগের সূচনায় এবং যতদিন পুঁজিবাদী অর্থনীতি প্রগতিশীল ছিল তত দিন সমাজে এই প্রবণতা বৃদ্ধি পায় নি। উনিশ শতকে যখন পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তখন থেকেই "সমকামী প্রবণতা" গণতান্ত্রিক অধিকার স্বরূপ স্বীকৃতি লাভের চেষ্টায় আন্দোলনের রূপ ধারণ করেছে। সুতরাং পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী যুগের সংস্কৃতি পূর্বতন ব্যবস্থার গর্ভে সৃষ্টি হওয়া সমকামী প্রবণতাকে বৃদ্ধি ও সমাজ স্বীকৃত করার দাবিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ধনাত্মক অনুঘটকের কাজ করেছে। এই অর্থনীতির সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতির প্রতিফলন হল সমকামী প্রবণতার গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবি। ১৯৬০ থেকে ২০১৩ – এই পর্যায়ে আমেরিকা ও ইউরোপে সমকামী প্রবণতার সর্বোচ্চ অধিকার "সমলিঙ্গে বিবাহ" পর্যন্ত বুর্জোয়াশ্রেণী আইন সিদ্ধ করেছে। **ক্ষয়িষ্ণু অর্থনীতির ধারক বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে এই অর্থনীতির পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, তাই অবক্ষয়ী অর্থনীতি থেকে উদ্ভুত অবক্ষয়ী সংস্কৃতিকে সমাজ স্বীকৃত করার আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করা ছাড়া তাদের অন্য কোনও উপায় নেই। সমকামিতাকে আইন সিদ্ধ করার মধ্য দিয়ে পর্ণ-সংস্কৃতির বাজার-এর প্রসার ঘটানো হয়েছে এবং হচ্ছে।** যে বাজার এক সময় শুধুমাত্র বিপরীতকামীদের যৌন সম্পর্কের মধ্যে সীমিত ছিল তা আজ সমকামীদের যৌন সম্পর্কের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করেছে। এই বাজারে যৌন প্রবণতা তথা সমকামিতা, উভয়কামিতা এক একটি পণ্য মাত্র। সম্প্রতি ওয়াশিংটন পোস্ট-এর এক রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে, সমাজে উভয়কামীতা (বাইসেক্সুয়াল) একটি ঢং হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহু টিনএজ মেয়েরা স্ট্রেইট থেকে লেসবিয়ান, লেসবিয়ান থেকে বাইসেক্সুয়াল এবং পুনরায় স্ট্রেইট-এ পরিণত হচ্ছে। ছেলেদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা ঘটছে। এখন ঘটনা হল টিনএজ ছেলে মেয়েদের এই রূপ যৌন প্রবণতার ইচ্ছা পূরণ হচ্ছে হরমোন থেরাপি করে। সমাজের অধিকাংশ মানুষ যখন টাকার অভাবে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা কিনতে পারছেন না, তখন তাদের পক্ষে শখ করে হরমোন থেরাপি কেনা সম্ভব – তা সহজেই অনুমেয়। একটা বিষয় জানা দরকার যে, যৌন প্রবণতা হরমোন সৃষ্টি করে না, কিন্তু গৌণ-যৌন চরিত্র নির্ধারণ করে হরমোন – যা অনুভূতি পূরণের সহায়ক। যৌন বিষয়ে প্রচার, প্রচার থেকে কৌতূহল, কৌতূহল থেকে জানা আর জানা থেকে অনুশীলন। এই প্রচারটাই যেমন একটা ব্যবসা, তেমন এই প্রচারই যৌন সংক্রান্ত সমস্ত ব্যবসার বাজার বৃদ্ধি করেছে।

আমরা দেখেছি ২০১২-এ প্যান আমেরিকান হেলথ অর্গানাইজেশন ঘোষণা দিয়েছে যে সমকামিতা রোগ নয় – মানুষের যৌন বেচিত্র। এই ঘোষণা কি উক্ত বাজারের পরিপূরক নয়? প্রগতিশীল সমাজ-সভ্যতা যৌন ব্যাভিচারকে, "যৌন বৈচিত্র" বলে মেনে নিতে পারে কি? যে যৌন ব্যাভিচার, যে যৌন উন্মাদনা – যৌন সঙ্গীরূপে সম ও বিপরীত লিঙ্গের মানুষ তো বটেই এমনকি গৃহপালিত ও বন্য প্রাণীদেরও বেছে নিয়েছে, যার ফলেই সৃষ্টি হয়েছে এইডস, সিফিলিস, গণোরিয়া'র মত যৌন রোগ – তাকেও কি যৌন বৈচিত্র বলা হবে? বিকৃত যৌন প্রবণতার চিকিৎসা কি ডাক্তারি শাস্ত্রের অ্যানাটমি, ফিজিওলজি বা প্যাথলজিতে পাওয়া সম্ভব?

যে সমাজে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সুস্থভাবে জীবন ধারণ করা সম্ভব, যে সমাজে সকলেরই সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ পাওয়া সম্ভব, যে সমাজে সকলেই কোন না কোন মননশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে সেখানেই এই ব্যাভিচার বন্ধ হওয়া সম্ভব। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীতে সমকামিতা অত্যন্ত সাধারণ বিষয়, অথচ অতীতের সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও নয়াগণতান্ত্রিক চীনের লাল ফৌজের মধ্যে সমকামিতার কোনও নজির পাওয়া যায় না।

সুতরাং ইতিহাস দেখায় যে, শ্রেণী বিভক্ত সমাজে মালিকশ্রেণীর অবক্ষয়ী সংস্কৃতির ফল হল সমকামিতা। কারণের অবসান ঘটালেই "বিষফল" জন্ম নেওয়া বন্ধ হতে পারে, অন্যথায় নয়। ■

–ঃবিজ্ঞপ্তিঃ–

সকল পাঠক বন্ধুর কাছে আবেদন, আপনারা পত্রিকার রচনা সম্পর্কে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত সমালোচনা পাঠান। বিজ্ঞান ও কুসংস্কার বিষয়ক রচনা, রিপোর্ট পাঠান। রচনা পরিষ্কার হরফে, পাতার একদিকে লিখে পাঠাবেন এবং কপি রেখে পাঠাবেন। কবিতা ও রচনা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সম্পাদকমন্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। – সম্পাদক

বিজ্ঞানের খবর

নভেম্বর ২০১৩

২৪. ●গ্রানাডা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিস্টোলজি বিভাগের টিস্যু ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ গ্রুপ এর বিজ্ঞানীরা স্টেম সেল থেকে ত্বকের এপিথিলিয়া স্তরের পুণর্গঠন করতে সক্ষম হয়েছেন। (দ্য হিন্দু)

●নাসার মুন এক্সরে অবসারভেটরি মিল্কিওয়ের কেন্দ্রে এমন একটি ব্ল্যাক হোলের সন্ধান পেয়েছেন যা অতি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কণার স্রোত প্রস্তুত করেছে। (দ্য হিন্দু)

২৬. ●হায়দারাবাদের অ্যাপোলো হাসপাতালের একদল কার্ডিয়ো থোরাসিক সার্জারী বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের প্রচেষ্টায় এক ব্যক্তির হৃদযন্ত্র প্রতিস্থাপন সম্ভব হয়েছে। (দ্য হিন্দু)

২৮. ●আজ আইসন নামক একটি ক্ষুদ্র ধূমকেতু সূর্যের অতি নিকটে চলে এসেছিল। (এম এস এন নিউজ)

ডিসেম্বর ২০১৩

২. ●হাবল স্পেস টেলিস্কোপ সৌরজগতের বাইরে এইচ ডি ২০৯৫৮ বি, এক্স ও - ১ বি, ডবলু এ এস পি ১২ বি, ডবলু এ এস পি ১৭ বি এবং ডবলু এ এস পি ১৯ বি নামক ৫ টি গ্রহে জলের সন্ধান পেয়েছে। (নাসা)

৪. ●আমেরিকার ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এমন একটি প্রোটিন পি সি ৭ আবিষ্কার করেছেন যা উৎকণ্ঠার অসন্তুলন (anxiety disorder) ও মানসিক আঘাত (trauma)-র ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। (নেচার পত্রিকা এবং পি এস এ এস পত্রিকা)

●স্পেনে বিশ্বের প্রাচীনতম মানব ডি এন এ-র সন্ধান পাওয়া গেছে। একটি ৪ লক্ষ বছরের প্রাচীন মানব ফসিলের ফিমার বোন থেকে এটি পাওয়া গেছে। (নেচার)

৫. ●মানুষের অন্ত্রে অবস্থিত অণুজীব দ্বারা ইঁদুরের দেহে অটিজ্‌ম এর মত রোগের চিকিৎসা সম্ভব হয়েছে। (নেচার)

৯. ●নাসার পাঠানো মার্স কিউরিওসিটি রোভার লালগ্রহ মঙ্গলের বুকে একটি অতি প্রাচীন জলাশয়ের খোঁজ পেয়েছে। এই মিষ্টি জলের হ্রদটি নিউ ইয়র্কের ফিঙ্গার লেক নামে পরিচিত ১১ টি হ্রদের কোন একটির মাপের। এই হ্রদটি যেখানে ছিল সেখানে কাদাপাথরের সন্ধান পাওয়া গেছে যা একমাত্র সম্ভব হতে পারে যদি কোন নিস্তরঙ্গ জলাশয় বহুদিন পরে থাকে। বিজ্ঞানীদের ধারণা এই হ্রদটি বহুদিন এমনভাবেই ছিল এবং এতে জল এবং মাটি থেকে কেমোলিথো অটোট্রপস জীবাণুদের থাকার সম্ভাবনা প্রবল। আরও বিস্তারিত গবেষণা এই প্রশ্নের উত্তর দেবে যে একসময় মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্ব ছিল কি না। (নাসা – নিউ ইর্য়ক টাইমস)

১২. ●বৃহস্পতির উপগ্রহ ইউরোপা-তে জলীয় বাষ্পের সন্ধান পেয়েছে হাবল স্পেস টেলিস্কোপ, যা শনির উপগ্রহ এনসেলাডাস এও পাওয়া যায়। (নাসা)

●মহিলাদের স্তন ক্যানসারের ক্ষেত্রে ৫৩ শতাংশ ক্ষেত্রে ক্যানসার প্রতিরোধকারী একটি ওষুধ আবিষ্কার করেছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর হেলথ এন্ড কেয়ার এক্সিলেন্স নামক প্রতিষ্ঠান। (ল্যানসেট মেডিক্যাল জানার্ল, দ্য গার্ডিয়ান)

১৩. ●চীনে ৮০ ফুট লম্বা এক ডায়নোসরের ফসিল আবিষ্কার করল পেনস্যালভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যালিওনটোলজিস্ট (পুরাজীববিদ) রা। (দ্য হিন্দু)

●কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল সেন্টারের একদল বিজ্ঞানী অ্যালজাইমার অথ্যাৎ 'মনের ভুল' রোগের উৎসস্থল চিহ্নিত করেছেন। মস্তিষ্কের এন্টোরাইনাল কর্টেক্সের ঠিক কোন অংশে এই রোগের উৎপত্তি তা এখন নিশ্চিত করে বলতে পারছেন গবেষকরা। এই আবিষ্কার এই দূরারোগ্য রোগের চিকিৎসাকে আরও একধাপ এগিয়ে দিল। (দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকা)

●যুক্তরাষ্ট্রের মিনিয়াপোলিসের মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা মস্তিষ্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হেলিকপ্টারের আবিষ্কার করেছেন, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'কোয়াডকপ্টার'। এর জন্য একটা ব্যবস্থা বানানো হয়েছে যাতে মস্তিষ্ক কোন বাইরের যন্ত্রের সাথে যোগাযোগ করতে পারে।

১৬. ●একটি আন্তর্জাতিক গবেষক দল নিয়েন্ডারথাল মানুষদের দেওয়া কবর আবিষ্কার করেছেন। ইরাক এবং ইসরাইলের মাটির নীচে পাওয়া ৪০ টি এইরকম কবর আবিষ্কার করে গবেষকরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে প্রাচীনকালে লিয়ান্ডারথাল মানুষরা মৃতদেহ কবর দিত। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে এই কবরগুলি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক কারণে মাটিতে জমা হওয়া মৃতদেহ নয়। (নিউ ইয়র্ক টাইমস্)

২০. ●ফরাসী বিজ্ঞানী অধ্যাপক অ্যালেইন কারপেন্টার স্বয়ং চালিত কৃত্রিম হৃদপিন্ড বানিয়েছেন জৈবপদার্থ এবং ইলেট্রনিক সেন্সার দ্বারা। প্যারিসের জর্জেস পম্পিদু ইউরোপীয়ান হাসপাতালে একজন মানুষের দেহে এটি সফলভাবে প্রতিস্থাপনও করা হয়েছে। (দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট

পত্রিকা)

৩১. ●জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সৌরমন্ডলের বাইরে জি জে ৪৩৬ এবং জি জে ১২১৪ বিগ্রহগুলিতে মেঘের দেখা পাওয়া গেছে। (নাসা)

জানুয়ারি ২০১৪

২. ●মায়োটিন ডিসট্রোফি ২, যা কিনা চোখে ছানি থেকে এক বিশেষ ধরণের হৃদরোগ, এন্ডোক্রিনের সমস্যা, মাংসপেশীর নষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো রোগের জন্য দায়ী–বিজ্ঞানীরা তার প্রতিরোধক একটি ওষুধের আবিষ্কার করেছেন। (দ্য স্ক্রিপ্টস্ রিসার্চ ইনস্টিটিউট)

৩. ●রক্তের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ক্যানসার কোষকে ধ্বংস করার এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন করোনেল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা। এই পদ্ধতিতে রক্তের নমুনার মধ্যে ই-সিলেকটিন (একটি আঠা) এবং টি আর এ আই এল (টিউমার নেক্রোসিস ফ্যাক্টর রিলেটেড অ্যাপোস্টোসিস ইন্ডিউসিং লিগ্যান্ড) প্রোটিনকে ইনজেক্ট করে দেওয়া হয়। এই টি আর এ আই এল লিউকোসাইট এর সাথে যুক্ত হয়ে যায় এবং তারপর থেকে যখনই টি আর এ আই এল-এর সাথে কোন ক্যানসার কোষ সংস্পর্শে আসে তখন সেটি নিজেকে ধ্বংস করে দেয়। (করোলেন বিশ্ববিদ্যালয়)

৮. ●৬০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরত্বে থাকা একটি নক্ষত্রপুঞ্জকে ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। এই নক্ষত্রপুঞ্জটি আনুমানিক ভাবে আজ থেকে বিগ ব্যাং হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে সৃষ্টি হয়েছিল। এর দ্বারা ডার্ক এনার্জিকে বুঝতে পারা সহজতর হবে যা কিনা মহাবিশ্বের বৃদ্ধিকে চালিত করছে। (ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়)

●সম্প্রতি হিসাব করে জানা গেছে যে পশ্চিম আফ্রিকায় সিংহের সংখ্যা নিদারুণভাবে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে সেখানে পরিণত সিংহের সংখ্যা মাত্র ২৫০। (পি এস ও এস ওয়ান)

১৩. ●রসায়নবিদেরা এমন একটি কৃত্রিম কোষের উদ্ভাবন করেছেন যা একটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপকে উপস্থাপন করতে সক্ষম। (নেচার কেমিস্ট্রি, র‍্যাডবাউন্ড বিশ্ববিদ্যালয়)

১৪. ●আন্টার্টিকায় গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের থেকেও অনেক গভীর একটি সুড়ঙ্গ আবিষ্কার হয়েছে। এটি পৃথিবীর অভ্যন্তরের অনেক নতুন অজানা তথ্য জানতে সাহায্য করবে। (নিউ ক্যাকসল বিশ্ববিদ্যালয়)

১৬. ●বিজ্ঞানীরা একটি নতুন জিন থেরাপী দ্বারা ৬ জন মানুষকে অন্ধ হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছেন একটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার দ্বারা। এই জিনকে বিজ্ঞানীরা রোগীর চোখে অস্ত্রোপচারের সময় চোখে ঢুকিয়ে দিয়ে আলো সংবেদি চোখের কোষগুলিকে পুনরুত্থাপিত করতে সাহায্য করেছেন। (বি বি সি নিউজ)

২১. ●ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এমন একটি যন্ত্রের আবিষ্কার করেছে যার সাহায্যে ওষুধের দ্বারা বিপাকক্রিয়া এবং রক্তে তার ঘনত্ব নির্ধারণ করা যাবে। এই যন্ত্রের সাহায্যে ভবিষ্যতে অনেক ওষুধের সঠিক প্রয়োজনীয় মাত্রা পরিমাপ করা সম্ভব হবে। (ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়)

২২. ●অ্যাস্টেরয়েড বেল্টের (বৃহস্পতি ও শনির মধ্যবর্তী গ্রহাণুপুঞ্জ) বামন গ্রহ সেরেসের মধ্যে জলীয় বাষ্পের নিশ্চিত উপস্থিতি আবিস্কৃত হযেছে। (নেচার পত্রিকা)

●গবেষকরা এটা নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে শিশুরা ৩ বছর বয়স পর্যন্ত তাদের সমস্ত স্মৃতি ৭ বছর বয়স হতে না হতেই সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে। (এমরয় বিশ্ববিদ্যালয়)

২৩. ●একটি নতুন ধরণের মাইক্রোস্কোপিক প্রযুক্তি দ্বারা ন্যানো স্কেলে তোলা প্রতিচ্ছবির ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করা সম্ভব হবে। (নর্থ ক্যারোলিনা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়)

৩১. ●চীনের এক ল্যাবরেটেরিতে বিজ্ঞানীরা বানরের জিন ক্রিস্পার/ সি এ এস কে পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছেন। এটি ডি এন এ প্রযুক্তি দ্বারা সম্ভব হয়েছে। (নানকিং মেডিক্যাল বিশ্ববি্যালয়)

ফেব্রুয়ারী ২০১৪

৩. ●বিজ্ঞানীরা এক অণু বিশিষ্ট এল ই ডি লাইট আবিষ্কার করেছেন। (সায়েন্স ডেইলি)

৫. ●সুইজারল্যান্ডের সুইস ফেডারেল ইনসটিটিউট অফ টেকনোলজির গবেষকরা মানুষের এমন একটি কৃত্রিম হাত ল্যাবরেটরিতে বানিয়েছেন যার মাধ্যমে অনুভূতি অনুভব করা যায়। হল্যান্ডের এক অধিবাসী, যিনি ৯ বছর আগে তার একটি হাত দুঘর্টনায় হারিয়েছিলেন, শরীরে এই কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত হাত প্রতিস্থাপনের পর দেখা গেছে যে ওই হাতের তিনটি আঙুলে তিনি অনুভূতি অনুভব করছেন। (এম আই টি টেকনোলজি রিভ্যু)

৭. ●পশ্চিম ইংলন্ডের হাপিসবার্গে ১০ লক্ষ বছর আগেকার মানুষের (সম্ভবতঃ হোমো অ্যান্টেসেসর) পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে। (নিউ ইয়র্ক টাইমস)

৮. ●মহাবিশ্বের এক প্রাচীনতম নক্ষত্র এস এস এস এস জে ০৩১৩০০.৩৬-৬৭০৪৩৯.৩ এর আবিষ্কার হয়েছে। (নিউ

ইয়র্ক টাইমস)

৯. ●সজীব কোষের ভিতর এই প্রথম ন্যানোমিটার এর নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে। এর দ্বারা কোষের গঠনবিদ্যা বা সেল বায়োলজি আরও বিস্তারিতভাবে জানা যাবে। (পেন স্টেট নিউজ)

১১. ●লন্ডনের কিংস কলেজের বিজ্ঞানীরা মস্তিষ্কের গঠনের সাথে বুদ্ধির সম্পর্কযুক্ত জিনকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন বলে দাবী করেছেন। যদিও বিজ্ঞানীদের মতে এই জিন বুদ্ধির ক্ষেত্রে খুব সামান্যই প্রভাবিত করতে পারে। তাই এই জিনটিকে বুদ্ধির জন্য দায়ী জিন বলে চিহ্নিত করা ঠিক নয়। (কিংস কলেজ, লন্ডন)

১২. ●বৃহস্পতির বৃহত্তম উপগ্রহ যা সৌরমন্ডলেরও বৃহত্তম, সেই গ্যানেমেডের ভূ-তাত্ত্বিক ম্যাপ তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। (সায়েন্স ডেইলি)

২০. ●লন্ডনে স্টেম সেল ব্যবহার করে হৃদরোগ উপশমের সবচেয়ে বড় গবেষণা শুরু হয়েছে। ইউরোপের ১১টি দেশের ৩০০০ রোগীকে নিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কাজ শুরু হয়েছে। এই গবেষণা সফল হলে হৃদরোগ মোকাবিলায় এক অভূতপূর্ব সাফল্য আসবে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। (বি বি সি নিউজ)

২৬. ●'ড্রপলেটন' নামক এক নতুন কোয়াসি পার্টিকল আবিষ্কার হয়েছে। (নেচার পত্রিকা)

২৮. ●জারকন ডেটিং করে পৃথিবীর সবচাইতে পুরানো পৃথিবীপৃষ্ঠের খোঁজ পাওয়া গেছে। এটি এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত সবচেয়ে পুরানো ভূত্বক (কাস্ট)।

●নাসার টেলিস্কোপে ধরা পড়ল সৌরজগতের বাইরের ৭১৫টি নতুন গ্রহ, যার মধ্যে ৪টির আকার ও আয়তন পৃথিবীর মত। (বি বি সি নিউজ)

বিজ্ঞানের সেরা ১০ আবিষ্কার - ২০১৩

[আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানের বিভিন্ন পত্রিকাগুলি বিগত বছর- ২০১৩ সালের সেরা ১০টি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে চিহ্নিত করেছেন। পাঠকদের অবগতির জন্য তার অনুবাদ ছাপা হল - সম্পাদকমন্ডলী, সমীক্ষণ]

* **মানুষের এমব্রায়োর ক্লোনিং**- অনেকবার অসফল প্রচেষ্টার পর গবেষকরা অবশেষে মানুষের ভ্রূণের ক্লোন থেকে স্টেম সেল নিষ্কাশন করতে সফল হয়েছেন। বিভারটনের ওরেগন ন্যাশানাল প্রাইভেট রিসার্চ সেন্টার-এর গবেষকরা ২০০৭ সালে বানরের ভ্রুণ-কে ক্লোন করার মাধ্যমে তার থেকে স্টেম সেল নিষ্কাশন করেছিলেন যা এই বছরে মানুষের ভ্রুণ-এর ক্লোন করার মাধ্যমে স্টেম সেল নিষ্কাশন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। এই সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় ক্যাফেইন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, এটি মানুষের ডিম্বানুর প্রধান প্রধান অণুগুলিকে স্থিতিশীল করতে সাহায্য করে।

* **ক্ষুদ্র অঙ্গের সৃষ্টি** - ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক, ক্ষুদ্র কিডনি ইত্যাদির মতো মানবদেহের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অঙ্গের সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা অর্ভূতপূর্ব অগ্রগতি করেছেন। এই ক্ষুদ্র অঙ্গের সৃষ্টি গুলি নানা জটিল রোগের গুরুত্বপূর্ণ মডেল তৈরীতে সাহায্য করবে যা আদতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটাবে। এই মডেলগুলি এইসকল অঙ্গ সংক্রান্ত বিভিন্ন রোগের জটিলতার কারণগুলি আরও নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে।

* **পারোভস্কাইট সৌর কোষ** - এক নতুন সৌর কোষের আবিষ্কার হয়েছে যা আগেকার সৌরকোষগুলি থেকে সস্তা। যদিও পারোভ্স্কাইট সৌরকোষগুলি বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের বিদ্যুৎ-উৎপাদনকারী সৌরকোষগুলি তুলনায় কম ক্ষমতা সম্পন্ন, তবে এই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতিসাধন চলছে।

* **ক্রিসপার** - সি এ এস ৯ নামক একটি ব্যাকটেরিয়ার প্রোটিন যা জিন সার্জারীতে কাজে লাগতে পারে। গবেষকরা ব্যাকটেরিয়ায় পাওয়া যায় এই প্রোটিনকে জিন-সার্জারীতে শল্য চিকিৎসায় ব্যবহৃত এর প্রকার ছুরি-র ন্যায় ব্যবহার করা যেতে পারে। এক ডজনেরও বেশি গবেষকরা এই ক্রিসপার-কে ব্যবহার করে গাছ, প্রাণী এমনকি মানুষেরও জিনের পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে।

*__কসমিক রশ্মি সুপারনেভা থেকে নির্গত__- যদিও ১০০ বছর আগেও আবিষ্কার হয়েছে তবুও বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত ছিলেন না উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কণা বা কসমিক রশ্মির কোথা থেকে এসেছে। তবে এইবারে সেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেলো, বিজ্ঞানীরা অবশেষে নিশ্চিত হলেন যে এই কসমিক রশ্মি কোনও সুপারনোভার-অবশেষ মেঘ বা বিস্ফারীত তারার থেকে সৃষ্টি।

*__গঠনীকৃত জীববিদ্যা প্রতিষেধক গঠনে সাহায্য করে__- এই বছর গবেষকরা একটি অ্যান্টিবডির গঠন ব্যবহার করে প্রতিষেধকের প্রধান উপাদান ইমিউনোজেন-এর ডিজাইন

গঠনের নক্সা গঠন করেছেন। এটি ছিল গঠনীকৃত জীববিদ্যাকে ব্যবহার করে রোগ-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এমন একটি শক্তিশালী যন্ত্রের গঠনের প্রথম উদাহরণ।

***আমাদের মাইক্রোব আমাদের স্বাস্থ্য-** আমাদের দেহে ছড়িয়ে থাকা যে কোটি কোটি মাইক্রোব বা জীবাণু আছে, যা আমাদের শরীরেই সববাস করে তাকে যদি বিভিন্ন ওষুধ ধর্তব্যের মধ্যে আনে তাহলে ওষুধগুলির কার্যকারিতা অনেকগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে।

***আমরা ঘুমাই কেন-** ইঁদুরের মধ্যে গবেষনা করার মাধ্যমে গবেষকরা আবিষ্কার করলেন যে মস্তিষ্ক তার নিউরোনের চ্যানেলকে প্রসারিত করার মাধ্যমে সেরিব্রোস্পাইনাল তরল প্রবাহিত করার দ্বারা মস্তিষ্ককে পরিষ্কার রাখে ও এই ব্যপারটি সবচেয়ে বেশি হয় ঘুমের সময়।

***ক্যানসার ইমিউনোথেরাপী- বিজ্ঞানীমহলের মতে ২০১৩ সালের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হলো ক্যান্সারের ইমিউনোথেরাপী**। বর্তমানে ক্যান্সারের চিকিৎসায় ক্যান্সার দ্বারা আক্রান্ত কোষকে টার্গেট বা লক্ষ্য করে চিকিৎসা করা হয়, কিন্তু ক্যান্সার ইমিউনোথেরাপীতে আক্রান্ত কোষকে টার্গেট না করে শরীরে প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে টার্গেট করা হয় আর তার মাধ্যমে টি - কোষ ও অন্যান্য প্রতিরোধক কোষকে ক্যান্সার প্রতিরোধের জন্য ব্যবহার করা। দেহস্থ প্রতিরোধক ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে ক্যান্সারের চিকিৎসার ফলাফল খুবই আশাব্যঞ্জক। যদিও রোগের উপর এর কি প্রভাব যার দরুণ এই রোগের চিকিৎসা সম্ভব হতে পারে তা এখনও পরিপূর্ণ ভাবে জানা যায় নি।

***ক্ল্যারিটি-** ক্ল্যারিটি একটি ইমেজিং প্রযুক্তি যার দ্বারা মস্তিষ্কের কোষের ঠিকমত পরিষ্কার চিত্র পাওয়া গেছে। সাধারণত কোষের কোষ পর্দায় অবস্থিত লিপিড কণা যা আলোকে বিক্ষেপিত করে যার জন্য কোষের সঠিক চিত্র পাওয়া সম্পূর্ণরূপে সম্ভব হতো না কিন্তু এই লিপিডকে 'ক্লিয়ার জেল' দ্বারা প্রতিস্থাপিত করার পরে কোষের প্রকৃত ইমেজ পাওয়া গেছে। এই প্রযুক্তি দ্বারা পুরানো পদ্ধতি দ্বারা মস্তিষ্কের ময়না তদন্ত করার পদ্ধতিকে প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে আর এর দ্বারা সবকটি নিউরনের সংখ্যা গণনা করা সম্ভব হবে।

(তথ্যসূত্র ঃ দ্য হিন্দু ৩০শে ডিসেম্বর ২০১৩)

সংগঠন সংবাদ

বইমেলায় সমীক্ষণ

বিগত শীতের মরশুমে রাজ্যের নানা প্রান্তে আমাদের সাধ্য অনুসারে আমরা বিগত বছরের মত জেলা, মহকুমা এবং স্থানীয় মেলাগুলিতে অংশ নিয়েছিলাম। তার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট ঃ

শিলিগুড়ি বইমেলা ঃ গতবারের মত এবারও শিলিগুড়ি বইমেলায় (২৯শে নভেম্বর থেকে ৮ই ডিসেম্বর) আমরা লিটল ম্যাগাজিন প্রাঙ্গনে আসন গ্রহণ করি। এবার আমরা গতবারের তুলনায় বেশী সাড়া পাই। সব বয়সী পাঠকরাই ভিড় করেছেন স্টলে। অনেকেই যোগাযোগ ধারাবাহিক করতে চেয়েছেন, উত্তর বঙ্গের অন্যত্র মেলায় আসতে বলেছেন। সাংগঠনিক শক্তির অভাবে আমরা অন্যত্র মেলায় যেতে পারিনি। সাংবাদিকরাও ভিড় করে আমাদের স্টলের ছবি তুলেছেন, সাক্ষাৎকার নিয়েছেন কর্মীদের। ইন্টারনেট এবং তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ বইয়ের পাঠক কমিয়েছে কি না এই প্রশ্নের জবাবে মেলায় আমাদের কর্মীরা বলেছেন - বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশকে নেগেটিভ চোখে আমরা দেখি না। দুটি আলাদা মাধ্যম। ইন্টারনেট জ্ঞানকে মানুষের মধ্যে বিস্তারে সাহায্য করে, আমরাও তার সাহায্য নিয়ে থাকি। প্রতিটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারকারী তার দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারেই তা করে থাকে। সিনেমা এসেছে বলে যাত্রা - থিয়েটার উঠে যায় নি।

সোনারপুর বইমেলা ঃ গতবারের মত এবারও (১৩ই ডিসেম্বর থেকে ২২শে ডিসেম্বর) মেলার লিটল ম্যাগাজিন প্রাঙ্গনে আমরা হাজির ছিলাম। এখানকার মেলায় ভিড় থাকলেও উৎসাহী বই-পত্রিকার পাঠক কম ছিল। বহু পাঠক যোগাযোগ করেছেন এবং পত্রিকা নিয়ে তাঁদের মতামত দিয়েছেন।

বেহালা বইমেলা ঃ গত ২ বছরের মত এবারও (১৩ই ডিসেম্বর থেকে ২২শে ডিসেম্বর) আমরা মেলার লিটল ম্যাগাজিন প্রাঙ্গনে ছিলাম। এবার আমরা পাঠকের সাড়া পেয়েছি সর্বাধিক, বহু পাঠক নিয়মিত গ্রাহক হতে চেয়েছেন, স্থায়ীভাবে যোগাযোগ রাখতে চেয়েছেন। প্রথম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, তৃতীয় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, সংকলন ইত্যাদি সংখ্যার প্রতি আগ্রহ ছিল সব চেয়ে বেশী। স্টলে লাগানো পোস্টারগুলি ছিল আকর্ষনীয়।

আসানসোল বইমেলা ঃ এবারই প্রথম আমরা লিটল ম্যাগাজিন প্রাঙ্গনে (১০ই জানুয়ারী থেকে ১৯শে জানুয়ারী) নিজস্ব টেবিল নিয়ে মেলায় অংশ নিয়েছি। বর্ধমান জেলার এই শহরেও সমীক্ষণের প্রতি পাঠকদের আগ্রহ আমাদের কর্মীদের অনুপ্রাণিত করেছে। প্রথম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, তৃতীয় বর্ষ ৩য় এবং ৪র্থ সংখ্যা,

সংকলন ইত্যাদি সংগ্রহের আগ্রহই ছিল সবচেয়ে বেশী। রানীগঞ্জ কলয়াখনি অঞ্চলের আসন্ন বিপদ নিয়ে আমাদের বিশ্লেষণাত্মক বক্তব্য পাঠকদের মনযোগ দিয়ে পড়তে দেখা যায়।

কলেজ স্ট্রীটে লিটল ম্যাগাজিন মেলা ঃ গত বছরের মত এবারও (২রা জানুয়ারী থেকে ৪ঠা জানুয়ারী) লিটল ম্যাগাজিন সমন্বয় মঞ্চের উদ্যোগে এই মেলায় আমরা অংশীদার হয়েছিলাম। নানা ধরণের পাঠক আমাদের পত্রিকা কিনেছেন এবং বহু বিষয় তাদের সাথে আলোচনা, বিতর্ক হয়েছে।

ভদ্রকালী বইমেলা ঃ হুগলী জেলার হিন্দমোটরের নিকট ভদ্রকালীতে (২৪ শে জানুয়ারী থেকে ২৬ শে জানুয়ারী) লিটল ম্যাগাজিন মেলায় আমরা এবছর প্রথম অংশ নিয়েছি। বেশ কিছু পাঠকের সাথে আমাদের পরিচয় ঘটেছে এই মেলায়।

আশুতিতে বিজ্ঞান মনস্ক'র সাপ সম্পর্কে প্রদর্শনী

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার আশুতি অঞ্চলের শাঁখারীপোতা গ্রামে গত ২৬শে জানুয়ারী ২০১৪, স্থানীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন 'জাগরণ' এর ডাকা এক ক্রিড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান মনস্ক অংশগ্রহণ করে। সারাদিন ব্যাপী ছেলেমেয়েদের খেলাধূলার পর বিকেলে সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে বক্তব্য পেশ হয়। এলাকার মানুষের চেতনা বিকাশে, স্থানীয় সমস্যা সমাধানে 'জাগরণ' কি ভূমিকা নিয়েছে এবং নিতে চায় তা তুলে ধরা হয়। এরপর আমাদের কর্মীরা সাপ নিয়ে মানুষের মনে থাকা নানা কুসংস্কার এবং প্রকৃত বিজ্ঞান তুলে ধরে, সাপে কাটলে করণীয় কি তা স্লাইড শো-র মাধ্যমে তুলে ধরে এবং গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি ব্লক-অঞ্চলে অ্যান্টিভেনাম চিকিৎসার ব্যবস্থা করার দাবী তোলে। শীতের রাতকে উপেক্ষা করে শত শত মানুষকে আগ্রহ ভরে অনুষ্ঠান দেখতে দেখা যায়।

মুর্শিদাবাদের রানীনগর অঞ্চলে কুসংস্কার বিরোধী প্রদর্শন

গত ১লা ফেব্রুয়ারী মুর্শিদাবাদ জেলার রানীনগর অঞ্চলের বাবলাবোনা গ্রামে স্থানীয় যুবকদের একটি কোচিং সেন্টারে বিজ্ঞান মনস্ক কুসংস্কার বিরোধী প্রদর্শন এবং সাপ থেকে আতঙ্ক ও মুক্তি নিয়ে অনুষ্ঠান করে। সারাদিনব্যাপী ছাত্রদের কুইজ, নাচ, গান, নাটক, বক্তব্য পেশ নিয়ে নানা অনুষ্ঠানের পর রাত্রে আমাদের অনুষ্ঠানে অসংখ্য মানুষ অংশ নেয়। যুবছাত্রদের একাংশ বিজ্ঞান মনস্ক'র সাথে সম্পর্ক তৈরী করতে আগ্রহ প্রকাশ করে।

ভারতীয় মুসলীম নারীদের সুরক্ষা বিষয়ক আলোচনা সভায় বিজ্ঞান মনস্ক

গত ২২শে ডিসেম্বর ২০১৩, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে "সাউথ কলকাতা সোসাইটি ফর এমপাওয়ারমেন্ট অফ উইমেন" নামক সংস্থা একটি সভার আয়োজন করে। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল "লিপিবদ্ধ আইনের ভিত্তিতে সুরক্ষার দাবিতে ভারতীয় মুসলীম নারী।" সভায় দেশের বিভিন্ন সংগঠন, প্রতিবেশী বাংলাদেশ এবং আরব দুনিয়া থেকে মুসলীম নারী সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। নিপীড়িত মহিলারা তাঁদের জীবনের করুণ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন যা থেকে বোঝা যায় বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজে মহিলাদের অবস্থান কোথায়। সভাপতি শ্রী মলয় সেনগুপ্ত বলেন "মহিলাদের সুরক্ষার জন্য যথেষ্ট আইন আছে, শুধু তা ঠিকঠাকভাবে প্রয়োগ করতে হবে।" সভার সঞ্চালিকা এবং সংগঠনের অন্যতম কর্ণধার শ্রীমতী খাদিজা বানু বলেন যে, নারীদের সুরক্ষায় যে সমস্ত আইন আছে তা যথেষ্ট নয় এবং তা বলবতও ঠিকভাবে হয় না। মহিলাদের সুরক্ষার জন্য আরও সংবেদনশীলতার সাথে ও মানবিকতার খাতিরে আইন প্রণয়ন করতে হবে। বিভিন্ন সংগঠন থেকে আগত প্রতিনিধিরা প্রায় অনুরূপ বক্তব্য রাখেন।

সভায় বিজ্ঞান মনস্ক'র প্রতিনিধি বলেন শ্রেণী বিভক্ত সমাজে নারীরা পুরুষদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে উত্তরাধিকারী উৎপাদনের যন্ত্রমাত্র। বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজও সমানাধিকারের কথা ব'লে নারীকে ভোগ্যপণ্য এবং সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রই বিবেচনা করে। ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থা এবং পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা একে অপরের পরিপূরক। তাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দ্বারা রচিত আইন নারীদের কোন্ সুরক্ষা দেবে? কোন্ অধিকার দেবে ?

বিজ্ঞান মনস্ক'র বার্ষিক অনুষ্ঠান

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সারাদিন ব্যাপী প্রবল বৃষ্টি এবং ঝোরো হাওয়ার মধ্যে বিজ্ঞান মনস্ক'র বার্ষিক অনুষ্ঠান হয় বেহালার জনকল্যাণ বিদ্যাপীঠ স্কুলের হল ঘরে। প্রবল দুর্যোগের মধ্যেও বেশ কিছু মানুষ সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে জড়ো হন। এবার আমাদের অনুষ্ঠানে সদস্য এবং সমর্থকরা ছাড়াও ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি, নেহাই সাংস্কৃতিক সংস্থা, এ আই আর এস ও, এ আই পি এস এফ প্রভৃতি সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হন এবং বহু সংগঠন দুর্যোগের জন্য আসতে না পারায় পরে দুঃখ প্রকাশ করেন।

সম্পাদকের ভাষণ দিয়ে সভার সূচনা হয়। এরপর হয় কয়েকজন স্কুল ছাত্রের করা বিজ্ঞানের প্রদর্শনী। ছাত্রছাত্রীরা মানব জীবনে বিজ্ঞানের ব্যবহার নিয়ে সুন্দর সুন্দর মডেল প্রদর্শন করেন। এরপর শুরু হয় পাঠকদের মতামত। মোট ৮ জন পাঠক সমীক্ষণের উপর মতামত দিলেও পত্রিকার ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভালো-মন্দ, দৃষ্টিভঙ্গী এবং

সহযোগিতা রাশি ঃ ১০ টাকা

বার্ষিক অনুষ্ঠানে সমকামিতা প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখছেন বালোলিত হালদার, দেবাশিস ভট্টাচার্য, বর্ণালী মুখার্জি এবং পার্থ সারথী মুখার্জি।
১৬ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

আসানসোল বইমেলায় বিজ্ঞান মনস্ক'র স্টল।
১৭ই জানুয়ারি, ২০১৪

বার্ষিক অনুষ্ঠানে বিজ্ঞানের মডেল প্রদর্শনরত এক ছাত্রী।
১৬ই ফেব্রুয়ারি ২০১৪

কী ধরনের লেখা থাকা উচিত তা নিয়ে তেমন মতামত উঠে আসেনি। সমীক্ষণের ইংরাজী সংস্করণের দাবি উঠেছে। কয়েকটি রচনার প্রশংসা এসেছে, পত্রিকাকে আরও আকর্ষণীয় করার প্রস্তাব এসেছে মাত্র।

এরপর বিতর্কমূলক আলোচনা শুরু হয়। সঞ্চালকরা বলেন এটা বিতর্ক প্রতিযোগিতা নয় যে নিজের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে যুক্তি পেশ করতে হবে। 'সমকামিতা কি বিজ্ঞান সম্মত' এই বিষয়ের উপর ৪ জন বক্তা প্রাণবন্ত বক্তব্য রাখেন। এই সংখ্যায় পৃথক রচনায় তা প্রকাশ করা হল।

বিতর্কমূলক আলোচনার পর নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়, তারপর শুরু হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে সেমিনার 'পরমাণু শক্তি কি মানব প্রগতির অন্তরায়'। এই বিষয়ে স্লাইড শো'র মাধ্যমে ৩ জন বক্তা তা পেশ করেন। এই সংখ্যায় পৃথক রচনা হিসাবে তা পেশ করা হল।

সবশেষে হয় নৃত্যানুষ্ঠান ও সঙ্গীত পরিবেশন। নৃত্যানুষ্ঠান সকলের মন ছুঁয়ে গেলেও সঙ্গীত পরিবেশনে রিহার্সালের অভাব নজরে এসেছে। ■